ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ।। ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

মার্কিন সাহায্য দুরাশা

ভারতকে একাই লড়তে হবে

গূঢ়পুরুষ ।। মুম্বাইতে পাক জঙ্গি হামলাকে কেন্দ্র করে এই প্রথম আন্তর্জাতিক স্তরে কিছুটা আলোড়ন হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হামলায় কমপক্ষে ২২ জন শ্বেতাঙ্গ নারী পুরুষ মারা গেছেন। অতীতে জঙ্গি হামলায় সাধারণ ভারতীয়রা প্রাণ হারিয়েছেন। তাই আমেরিকা ইয়োরোপের শ্বেতাঙ্গ সমাজে কোনও হেলদোল হয়নি।

অথচ ১৯৭০-২০০৮ এই সময়ে ভারতের মাটিতে ৪,১০০টি জঙ্গি হামলায় ১২,৫৪০ জন ভারতীয় নিহত হন। এই তথ্যটি জানিয়েছে আমেরিকার মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল টেররিজম ডাটাবেস বিভাগ ও আমেরিকার ন্যাশনাল কনসোরটিয়াম ফর দি স্টাডি অব টেররিজম এন্ড রেসপন্সেস টু টেররিজম বিভাগের গবেষকরা। তাঁরা জানিয়েছেন, ভারতে এখন ছোট বড় মোট ৫৬টি ইসলামি জঙ্গি সংগঠন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত আছে। বলা হয়েছে জঙ্গি হামলা সবচেয়ে বেশি হয়েছে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ এই দুই বছরে। ১৯৯১-র জঙ্গি হামলায় মারা যান ১,১৮৪ জন। পরের বছর ১৯৯২ সালে জঙ্গি হামলায় মৃতের সংখ্যা ১,১৩২ জন। আন্তর্জাতিক স্তরে তখন কোনও হেলদোল হয়নি। ভারতেও নয়। এরপর ২০০১ সালে ৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে আল কায়দার হামলায় নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হওয়ার পরেই মার্কিন সরকার নড়ে চড়ে বসে। কারণ, সেই হামলায় ২,৯৭৪ জন মার্কিন নাগরিক নিহত এবং ৬,৩০০ জন গুরুতর আহত হন। এরপরেই মার্কিন সরকার হুংকার দিয়ে বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তখন ভারতের আমজনতা বিশ্বাস করেছিল যে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ জর্জরিত ভারতবাসীকে রক্ষা করতে মার্কিন সরকারের সক্রিয় সাহায্য পাওয়া যাবে। অন্তত কাশ্মীরে পাক সরকারের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের ছায়াযুদ্ধ বন্ধ করতে পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করা হবে। কিন্তু মার্কিন সরকার তা করেনি। উল্টে পাকিস্তানকে ঢালাও অস্ত্র সরবরাহ করেছে। আমেরিকার কাছে আল কায়দা ও ওসামা বিন লাদেন ছাড়া দ্বিতীয় কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও জঙ্গি নেতা এই বিশ্বে নেই। তাই আফগানিস্তানের মাটিতে আল কায়দার ঘাঁটি ধ্বংস করতে পাকিস্তানকে হাতে রাখা দরকার। এই মার্কিন নীতি যে কতটা ভ্রান্ত তার প্রমাণ-- গত সাত বছরে পাকিস্তানের সাহায্যে আল কায়দা এবং তার জঙ্গি তালিবানদের দমন করা যায়নি। উল্টে তালিবানদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং শাসকরা তালিবান জঙ্গিদের ধ্বংস চায় না। এই ইসলামি জঙ্গিরাই পাকিস্তানের হাতের তুরুপের তাস। যে তাস দেখিয়ে সেখানের শাসকরা ঢালাও অর্থ ও সামরিক সাহায্য পায়।

আমাদের মনে রাখতে হবে পাকিস্তান ও

(এরপর ৪ পাতায়)

হিন্দী বলয়ে দুই-দুই

মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়ে বিজেপি, দিল্লী-রাজস্থানে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এবারে বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দী বলয়ে ফলাফল দুই-দুই হয়ে গেল। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় বিজেপির দখলেই রইলো। অন্যদিকে দিল্লীকে নিজেদের হাতে তো রাখলই, সেইসঙ্গে বিজেপির হাত থেকে রাজস্থানকে ছিনিয়ে নিল কংগ্রেস। জাতীয় নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে মিজোরাম তত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও সেখানেও জিতেছে কংগ্রেস।

লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে কংগ্রেস পাঁচটির মধ্যে তিনটি রাজ্য জিতে মনোবল তুঙ্গে তুলতে পেরেছে। দেশজুড়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা, বিশেষত ২৬ নভেম্বর মুম্বাইয়ের মারাত্মক হামলার ফলে নিরাপত্তা রক্ষার প্রশ্নে যে কংগ্রেস ব্যাক ফুটে চলে গিয়েছিল, তারাই এখন ধাক্কা সামলে ফ্রন্ট ফুটে চলে এল বলা যেতে পারে। চুলচেরা বিশ্লেষণ বের হতে আরও কয়েকদিন লাগবে। তারপর সব দলই তাদের জয়-পরাজয়ের হিসাব, কারণ খুঁজবে। তবে রাজস্থানে দলের ভরাডুবির কারণ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি হার স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, দলের ভিতরকার দ্বন্দ্বই রাজস্থানে পরাজয়ের কারণ। উল্লেখ্য, এবার রাজস্থানে বিজেপি দলের ৫৪ জন বিধায়ককেই টিকিট দেয়নি। তাঁদের অনেকেই বিক্ষুব্ধ প্রার্থী হয়ে দলীয় প্রার্থীর পরাজয়ে ভালোমতো ভূমিকা পালন করেছেন। আবার অনেকে জিতেও গেছেন। বিক্ষুব্ধ প্রার্থী যে কংগ্রেস দলের ছিল না, তা নয়। তবে বিজেপিকে দাম বেশি দিতে হয়েছে। দুই দল মিলিয়ে এগারো জন বিক্ষুব্ধ প্রার্থী জিতেছেন। রাজস্থান বিধানসভার ২০০ আসনের মধ্যে ১৯৯ আসনে মায়াবতীর বহুজন সমাজবাদী পার্টি প্রার্থী দিয়েছিল। তারাও সাতটি আসনে জয়লাভ করেছে। কিন্তু শতাংশের হিসেবে ভোটের হার বি এস পি অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছে। তাতে লাভ-ক্ষতি কোন্ দলের হল সেটাও জানতে কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। 'বসপা' রাজস্থান বিধানসভায় ১৯৯৮ সালে ২.১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। পরের বার ২০০৩ সালে পেয়েছিল ৩.৯৭ শতাংশ ভোট এবং এবার ৭.৯৮ শতাংশ ভোট পেয়ে সাতটি আসনে জয়লাভ রাজস্থানে বহুজন সমাজবাদী পার্টিকে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

দিল্লীতে পরাজয়ের কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং এবং দলের অন্যতম কাণ্ডারী অরুণ জেটলি। বিজয় কুমার মালহোত্রাকে লোকসভা থেকে বিধানসভায় এনে বিজেপি বাজিমাৎ করতে পারল না। কংগ্রেসের স্লোগানই অরুণ জেটলির স্লোগান-এর কাছে 'মহঙ্গা' হয়ে গেল। জেটলি বলেছিলেন —'মহঙ্গী পড়ি কংগ্রেস'। আর কংগ্রেস বিজ্ঞাপন করেছিল — বিজেপি পর ভারি পড়েগা কংগ্রেস।

অন্যদিকে সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান এবং ছত্তিশগড়ে ডাঃ রমণ সিং-এর ক্যারিশমার কাছে কংগ্রেস দাঁড়াতে পারেনি। দেশের মধ্যে ছত্তিশগড়ের বহু জেলাই অনেক পশ্চাৎপদ। সেখানে রমণ সিং হয়ত উন্নয়ণের প্লাবন বওয়াতে পারেননি, কিন্তু তিনি দুঃখ-দারিদ্র্যমোচনে সবার পাশে দাঁড়িয়ে আন্তরিকভাবে প্রয়াস করেছেন। আর তার ফলও পেয়েছেন। মধ্যপ্রদেশে আগের বারের তুলনায় বিজেপি-র আসন কমেছে, কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বও অনেকটা সাহায্য করেছে। লোকসভা নির্বাচনের আসন্ন লড়াইয়ে বিজেপি-কে এবার নতুন করে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে।

মধ্যপ্রদেশ

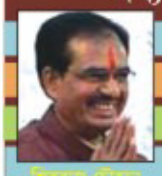

শিবরাজ চৌহান

আসন ২৩০
বি জে পি ১৪৪
কংগ্রেস ৭০
অন্যান্য ১৬

দিল্লী

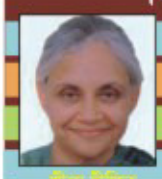

শীলা দীক্ষিত

আসন ৬৯
কংগ্রেস ৪২
বি জে পি ২৩
অন্যান্য ৪

রাজস্থান

বসুন্ধরা রাজে

আসন ২০০
কংগ্রেস ৯৮
বি জে পি ৭৫
অন্যান্য ২৭

ছত্তিশগড়

ডাঃ রমণ সিং

আসন ৯০
বি জে পি ৫০
কংগ্রেস ৩৮
অন্যান্য ২

মিজোরাম

জোরামথাঙ্গা

আসন ৪০
কংগ্রেস ৩২
এম এন এফ ৩
অন্যান্য ৫

কলকাতায় গো-রক্ষা আন্দোলনে সামিল মুসলিমরা

গো-হত্যার প্রতিবাদে কলকাতায় মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের সভা। — ছবি ঃ শিবু ঘোষ

প্রাণ প্রতিম পাল ঃ কলকাতা ।। "গরু বাচেগী তো দেশ বাচেগা" — এই স্লোগান তুলে রাজধানী শহর কলকাতার বুকে গোহত্যা বন্ধে সামিল হল খোদ মুসলিমরাই। সর্বোদয় বিচার পরিষদ, অভ্যুদয় লোক কল্যাণ সংস্থান সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চও গোহত্যা এবং গো-পাচার বন্ধ করার দাবিতে সরব হল। গত ১ ডিসেম্বর থেকে কলকাতার মহাজাতিসদন মেট্রো স্টেশনের কাছে ধর্ণা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তারা। আন্দোলন চলেছে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১২ দিনের এই আন্দোলনকে ঘিরে কলকাতার বিভিন্ন মহলে মিশ্র সাড়া পাওয়া গিয়েছে। গোহত্যা বন্ধ করতে কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে গো-প্রেমীরা এই আন্দোলনে হাজির হয়েছেন। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে হিন্দু-মুসলিম সদস্যরা ধর্নায় অংশ নিয়েছেন।

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত সদস্য খালিদ আনসারী বলেন, গোহত্যা বন্ধের যে আদেশ মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট (১৬।১১।৯৪) জারি করেছিল, তা বাস্তবায়িত করতে কোনও রকম কড়া পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেয়নি। গরুর চোরাচালান আটকাতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন যা খুবই লজ্জার। আন্দোলনের প্রথম দিন (১ ডিসেম্বর) গোরক্ষা আন্দোলনের মঞ্চে ভাষণ দিতে এসেছিলেন বিহারের রাজ্যমন্ত্রী অধ্যাপক শামশের। আন্দোলনে সভাপতিত্বও করেন তিনি। অধ্যাপক শামশের তাঁর ভাষণে বলেন, প্রত্যেক মুসলমানেরা যে দেশে বসবাস করে সেই দেশের আইন-কানুন তাদের মেনে চলতে হয়। ভারতে গোহত্যা নিষিদ্ধ। ইসলাম ধর্মে নিজের অধিকারের চেয়ে অন্যের অর্থাৎ প্রতিবেশীর অধিকারকে বেশী গুরুত্ব দেওয়ার রীতি আছে। ভারতের অমুসলমান সমাজ গরুকে স্নেহ করে, ভালবাসে। গরুর দুধ পান করার জন্য গরুকে 'মাতৃতুল্য' বলে মনে করে। আসন্ন বকরীদ-এ বাংলার মুসলিম সমাজের কাছে গোহত্যা

(এরপর ৪ পাতায়)

ভারতে ৫০০ আত্মঘাতী জঙ্গি ঢোকাতে চায় পাকিস্তানী তালিবান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মুম্বাই বিস্ফোরণে দোষারোপের আঙুল পাকিস্তানের দিকে তুলতে না তুলতেই 'সব তালিবান এক হও' 'ঝাঁপাতে হবে ভারতের উপর সদলবলে' ইত্যাদি স্লোগান তুলে পাকিস্তানের তেহরিক-ই-তালিবান ও মৌলবী নাজির-এর তালিবান দল স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে তারা কোনমতেই পাকিস্তানের মাটিতে ভারতের আক্রমণ সহ্য

করবে না। মৌলবী নাজিরের দল আরও জানিয়েছে যে, ভারতে ৫০০ জন সুইসাইড বোম্বার ঢোকাবে এবং ১৫,০০০ তালিবানিকে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে ভারতের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য রাখবে। নিষিদ্ধ তেহরিক-ই-তালিবান দলের কারি হাসান দক্ষিণ ওয়াজিরিস্থান থেকে জানিয়েছে যে ভারতের মতো দেশকে মুম্বাই বিস্ফোরণের জন্য পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করতে দেবে না। পাকিস্তানী তালিবানের সহনেতা মৌলানা ফকির মহম্মদ বলেছে, পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে ভারত জঙ্গিদের লেলিয়ে দিচ্ছে এবং মুম্বাই আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে পাকিস্তান ও মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। ভারতের মুসলমানদের প্রতি বিভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই নাকি এই আক্রমণের অন্যতম কারণ। পাকিস্তানি তালিবানরা ভারতকে সতর্ক করে আরও বলেছে, ভারতের দিক থেকে কোনওরকম আক্রমণ পাকিস্তানী সেনা ও মুজাহিদিন একসাথে প্রতিহত করবে। পাকিস্তানের বেআইনী জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-ইসলামও এক ভারত বিরোধী বিবৃতিতে জানিয়েছে, আমাদের সামনে আমাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস আছে। আমাদেরও ধর্মীয় দায়িত্ব সীমান্তের কোনও (ইঙ্গিতে ভারত) দেশ আঘাত করলে তা দমন করব।

জামাত-উদ্-দ্বাহা'র ইয়াদা মুজাহিদ ভারতের আনা মুম্বাই বিস্ফোরণে সাইদ নামে এক জঙ্গির যোগসূত্রের খবর মিথ্যা বলেছে। মুজাহিদের কথায় এর আগে কোনও সরকারই তাদের দিকেআঙ্গুল তোলেনি এবং এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকর্মী ও কূটনীতিকদের ব্যর্থতা ঢাকতে একটা অপপ্রচার। ভারত নাকি পাকিস্তানের কাছে উত্তেজনামূলক দাবি করে নিজের দেশবাসীর সাথেই প্রতারণা করছে বলে তারা অভিযোগ করেছে।

বাংলাদেশী বন্দীদের নিয়ে বিপাকে সরকার

মহাবীর প্রসাদ টোডি।। সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও রাজ্যের বিভিন্ন জেলে (সংশোধনাগারে) বন্দী কয়েকশো বাংলাদেশীকে বাংলাদেশ সরকার ফিরিয়ে না নেওয়ায় রাজ্যের কারা দপ্তর উদ্বিগ্ন।

অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি নিয়ে গড়িমসি করছে। ফলে সাজার মেয়াদ শেষ হলেও ওই সব বাংলাদেশী বন্দীদের নিয়ে রাজ্য সরকার চরম বিপাকে পড়েছে। কারা দপ্তর বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছে।

এদিকে জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, উত্তর দিনাজপুর-এর রায়গঞ্জ ও ইসলামপুরে বর্তমানে ৬১ জন বাংলাদেশীর সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে না। এর মধ্যে ইসলামপুরের সংশোধনাগারে এমন বন্দীর সংখ্যা ২৯ জন। আর রায়গঞ্জে ৩২ জন। এদের অধিকাংশের প্রায় এক বছর আগেই সাজার মেয়াদ শেষ হয়েছে। ফলে উত্তর দিনাজপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলে স্থানাভাব দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশী বন্দীদের ভরনপোষণের জন্য সরকারের ব্যয়ও বাড়ছে।

কারা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে যে, বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলে প্রায় ১৫০০ জন বাংলাদেশী রয়েছে। তাদের

অধিকাংশেরই সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। তারা এখন পুশব্যাকের অপেক্ষায় দিন গুণছে। এমনিতেই পুশব্যাক প্রক্রিয়া ভীষণ জটিল। আদালতের আদেশ পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করতেই বহু সময় লেগে যায়। তার উপর বাংলাদেশ সরকারের ঢিলেমির জন্য গোটা বিষয়টি বর্তমানে বিশ বাঁও জলে।

কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী বলেন যে, এমনিতে পুশব্যাক প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ। তার উপর বাংলাদেশের তৎপরতার অভাবে রাজ্যে এই সমস্যা ভীষণ জটিল আকার নিয়েছে। শীঘ্রই এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে, পরিস্থিতি যে আরও জটিল হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

জেলার তথ্যাভিজ্ঞ মহল এ অভিমত প্রকাশ করে বলেছে যে, এই জেলা সহ প্রায় গোটা রাজ্যের জেলেই বন্দীদের পর্যাপ্ত থাকার জায়গার অভাব এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দিতে না পারার সমস্যা অনেক দিনের। তার উপর সাজার মেয়ার শেষ হওয়া কয়েকশো বাড়তি বন্দী থাকায় এ সমস্যা আরোও বেশী বেড়েছে।

সন্ত্রাস রুখতে চাই জাতীয় ঐক্যমত — মোহন ভাগবত

মুম্বাইয়ে আক্রমণকারী সন্ত্রাসবাদীদের ভারতীয় কমান্ডোরা নিকেশ করে দেওয়ায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবত এক বিবৃতিতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় নতুন করে এক দৃঢ় সদিচ্ছার সঙ্গে যথাযথ কঠোর পদ্ধতি গ্রহণের জন্যও আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এখন রাজনৈতিক মতপার্থক্য-এর উপর উঠে সবাই মিলে আন্তরিকতার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সমগ্র রাষ্ট্র যথেষ্ট পরিপক্কতার পরিচয় দেবে। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, সন্ত্রাসবাদ বর্তমানে এক বিশ্বজনীন ঘটনা। আমাদের জাতি গত ১৫ বছর ধরে এই জেহাদি সন্ত্রাস-এর লক্ষ্য। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রও জেহাদি সন্ত্রাসীদের টার্গেট। এখন সময় হয়েছে সকল শান্তিকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একজোট হয়ে জেহাদিকে সন্ত্রাসবাদের শিকড় সহ উপড়ে ফেলার।

সারা দেশ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রতি মিনিটে মুম্বাইয়ের ঘটনা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা হল, এই জেহাদি আক্রমণে দুই শতাধিক সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন, অনেক নিরাপত্তাকর্মী ও কমান্ডো শহীদ হয়েছেন। শীর্ষস্থানীয় নিরাপত্তা অফিসাররাও নিহত হয়েছেন। যে সকল হোটেলগুলিকে টার্গেট করা হয়েছিল, সেখানের কর্মীরা অতিথিদের সেবা করতে গিয়ে হতাহত হয়েছেন। ভারতের ঐতিহ্যই হল 'অতিথি দেবো ভব'। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দেশ সকলকেই শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। সন্ত্রাসবাদ হল গণতান্ত্রিক, সভ্য পৃথিবীর বিরুদ্ধে ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণে গঠিত এক উগ্র উন্মাদী যুদ্ধ। এই উন্মত্ততাকে প্রতিহত করতে 'জাতীয় ঐক্যমত ও সদিচ্ছা'-প্রথম

মোহন ভাগবত

প্রয়োজন। এই সঙ্কটের সময়ে দেশবাসীকে সশস্ত্র বাহিনী এবং নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির (যারা এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত) সঙ্গে একজোট হয়ে একতা প্রদর্শন করতে শ্রীভাগবত অনুরোধ জানিয়েছেন।

এতসব সত্ত্বেও শ্রীভাগবত সকল দেশপ্রেমিক ভারতবাসীকে সার্বজনিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে সকল বীর যোদ্ধা মুম্বাইয়ে শহীদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা তাঁদের আত্মবলিদানের জন্যই আমরা শান্তি ও সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারছি।

ক্যাডারদের কারসাজিতে বর্ধমানের কালিবাজার থেকে মুছে গেল পুরনো স্কুল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। শুধু মৌরসীপাট্টাই নয় রীতিমত স্বেচ্ছাচারিতা শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। বর্ধমান শহরের ৮ নং ওয়ার্ডের কালিবাজার এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুযায়ী গত ২০ বছর ধরে চলে আসা একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে চক্রান্ত করে ছাত্রশূন্য করে সেখানে অর্থ উপার্জনের জায়গা করে তুলেছে শাসকদল। এমনকী ওই স্কুলটিকে সুসজ্জিত বিয়েবাড়ি করে পৌরসভার উদ্যোগে গত ২৩ নভেম্বর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

দেখা যাচ্ছে, একদিকে বেসরকারি নার্সারী ও ইংরেজি মাধ্যমগুলোকে তোল্লা দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে সরকারি স্কুলগুলোকে অধিকাংশ জায়গায় নামমাত্র ঠিকিয়ে রাখা হয়েছে যাতে সরকারি খরচায় পার্টিবাজি করা যায়। যেমন পার্টির মিটিং মিছিলে মাস্টার কেরানিদের কাজে লাগানো, স্কুল চত্বরকে পার্টির সহযোগী সংস্থা এস এফ আই, ডি ওয়াই এফ আই-এর সাংগঠনিক কর্মকান্ডের বৈঠকখানা তৈরি করা হয়েছে।

এক শ্রেণীর বাসিন্দাদের মতে ঘটনাটি এত সূক্ষ্ম কৌশলে করা হয়েছে যাতে স্থানীয় মানুষ সংগঠিতভাবে এর কোনও প্রতিবাদই জানাতে পারেনি। এমনকী প্রচার মাধ্যমের কাছেও এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উঠে আসতে পারেনি। এজন্য অবশ্য স্থানীয় বাসিন্দারা বর্ধমান পৌরসভার বর্তমান ও প্রাক্তন দুই পৌরপিতার কূট অভিসন্ধি ও সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার রাজনৈতিক দক্ষতাকে বাহবা দিতে হয়।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্বাগত জনাদেশ

সম্প্রতি সারা দেশে ছয়টি রাজ্যের নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল আমাদের হাতে আসিয়াছে। দেখা যাইতেছে ভারতীয় জনতা পার্টি দুইটি রাজ্যে নিজেদের ক্ষমতা ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। অন্যদিকে তিনটি রাজ্যে নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করিয়াছে। রাজস্থান ও মিজোরাম-এ ক্ষমতাসীন দল পরাজিত হইয়াছে। জয়ী হইয়াছে কংগ্রেস। ২০০৪ সালে কেন্দ্রে ইউ পি এ সরকারের ক্ষমতাসীন হইবার পর হইতে একের পর এক রাজ্যে বিধানসভা ভোটে হারিতে হারিতে সোনিয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়া গিয়াছিল। মাত্র কয়েক মাস আগেই দক্ষিণে কর্ণাটকে বিজেপি ভোটে জিতিয়া ক্ষমতা দখল করায় কংগ্রেস রীতিমতো কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছিল। সেইক্ষেত্রে এই ফলাফল যে কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অনেক ভাবনা-চিন্তা করিয়াই ভোটদাতারা এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছে।

এইবারের নির্বাচনে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইতেছে। যেমন দিল্লীতে শীলা দীক্ষিত-এর সরকার পরপর তিনবার নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে দুই মুখ্যমন্ত্রী নিজেদের কর্মের মাধ্যমে জনতাকে প্রভাবিত করিয়াছে। শুধু তাই নয়, ওই দুই রাজ্যে বিক্ষুব্ধ মন্ত্রীদেরও জনতা পর্যুদস্ত করিয়া ছাড়িয়াছে। প্রতিষ্ঠান বিরোধী তত্ত্ব এক্ষেত্রে কার্যকর হয় নাই। যাহারা জনতার জন্য কাজ করিয়াছে, তাহারাই জয়ী হইয়াছে। দিল্লীর মতো চওড়া মসৃণ রাস্তা, ফ্লাইওভার বা মেট্রো রেল ছত্তিশগড়ে হয় নাই সত্য, কিন্তু রমণ সিং রাজ্যের দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সালভা জুড়ুম গড়িয়া তাহাদের নিরাপত্তা বিধান করিয়াছেন। মোদী, শিবরাজ, রমণ, শীলা কাজ করিয়াই জিতিয়াছেন।

এমনকী মূল্যবৃদ্ধি, সন্ত্রাস, কৃষকদের আত্মহত্যার মতো ইসুও এই নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলিতে পারে নাই। ২৬।১১-র মুম্বাই-এ সন্ত্রাস ২৯।১১-তে দিল্লীর নির্বাচনে প্রভাব ফেলিবে বলিয়া যাহারা ভাবিয়াছিলেন, তাহারা হতাশ হইয়াছেন। সন্ত্রাসের মোকাবিলা যে রাজ্যস্তরে নয়, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগেই তাহা সম্ভব — ভোটদাতাদের এই বিচক্ষণতাই ইসুটিকে প্রাধান্য দেয় নাই। এধরনের ইসুগুলির ক্ষেত্রে কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য।

এই প্রথমবার বোধ হয় ভোটদাতাদের বিচার করিবার ক্ষমতা ঠিকঠিক ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। যেখানে যেমন সেখানে তেমন তাহারা ভোট দিয়াছে। ভোটদাতারা কোনও প্রকার জোয়ারে গা ভাসাইয়া দেয় নাই। তাহারা কংগ্রেসকেও পুরোপুরি সমর্থন করে নাই, আবার একইভাবে বিজেপি-কেও বিসর্জিত করে নাই। গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কী ভালো হইতে পারে? প্রভাবশালী বিরোধী পক্ষই সরকারকে সঠিক পথে চলিতে বাধ্য করিতে পারে। গত পাঁচ বছরে প্রভাবশালী বিপক্ষ না থাকার কারণেই সরকারের কাজকর্মে সামন্ততান্ত্রিক আচরণের অভিযোগ উঠে।

এইবারের নির্বাচনে ভোটদাতারা আরও একটি কাজ করিয়াছে। তাহারা জাতপাতের রাজনীতিকে ছাঁটিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সুমিত্রা সিংহ, হরেন্দ্র মির্ধা, ডাঃ হরি সিংহ-এর মতো জাঠ নেতারা ভোটযুদ্ধে ধরাশায়ী হইয়াছেন, আবার বিশ্বেন্দ্র সিংহ-এর মতো প্রবীণ নেতাদেরও বিদায় জানানো হইয়াছে। গুজ্জর-মীনা আন্দোলনের প্রভাবও স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়াছে। জনজাতিদের ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। আগের মতো তাহারা এখন হাওয়াতে গা ভাসাইয়া দেয় নাই। এইসব কারণে দুই পক্ষেরই হেভিওয়েট প্রার্থীরা নির্বাচনী রণে পরাজিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস-এর নারায়ণ সিংহ, বি ডি কল্লা, ডাঃ চন্দ্রভান এবং অন্যদিকে বিজেপির অধ্যাপক সাঙরলাল, প্রতাপ সিংহ সিন্ধোবী, জসকৌর মীনা প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজস্থানে কংগ্রেস সভাপতি সি পি যোশী পর্যন্ত মাত্র এক ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে— যাহাদের বিরুদ্ধে জনাদেশ গিয়াছে, তাহাদের যেন কোনও লাভজনক পদে পুনর্বাসন দেওয়া না হয়। কেননা তাহা হইলে জনাদেশের-ই অমর্যাদা করা হইবে।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। এই নির্বাচনে উন্নয়ণের স্লোগান কোনও প্রভাব বা ভোটদাতাদের মনে তেমন রেখাপাত করিতে পারে নাই। গতবারে লোকসভা নির্বাচনেও এই ধারাটি লক্ষ্য করা গিয়াছিল। ‘ভারত উদয়’ স্লোগান বা ফিল গুড ফ্যাক্টর কাজ করে নাই। রাজস্থানে গেহলট সরকারের বিশ্বাস ছিল যে উন্নয়ণের স্লোগান তুলিয়া সরকারে ফিরিয়া আসিবে। এইবার বসুন্ধরা রাজে সরকারও এই পথে হাঁটিয়াছিলেন। তাহাতে অবশ্য চিঁড়া ভেজে নাই। আসলে পারস্পরিক বোঝাবুঝির অভাবেই বসুন্ধরা রাজে সরকার ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিতে পারিল না। একই কারণে মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসেরও সেই হাল হইয়াছে। ভোটদাতাদের পছন্দ-অপছন্দ স্পষ্টভাবেই জানা গিয়াছে। দুই দলের পক্ষেই আত্মসমীক্ষা একান্ত জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। কেননা লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। আর এই নির্বাচনের প্রভাব সেখানে পড়িবেই।

নতুন প্রজন্ম কি চায় এই নির্বাচনী ফলাফলে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। নবগঠিত মন্ত্রিসভা যদি নিজেদের কাজের জবাব দিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলে পরিণামে ভালো হইবে। এর অন্যথা ঘটিলে তাহার ফল ভুগিতে হইবে। জবাবদিহি বা ক্ষমতা হারাইবার ভয় যদি প্রত্যেকের মনে থাকে তবে সরকার ও বিরোধী দুই পক্ষই জনতার দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবে। এই জনাদেশ তাই স্বাগত।

মুম্বইয়ে সন্ত্রাস ঃ ইউ পি এ-র অপদার্থতার দলিল

স্বপন দাশগুপ্ত

মুম্বাইয়ে ৬০ ঘন্টার আতঙ্ক মানুষের মনে তীব্র পরস্পর বিরোধী প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। একদিকে স্বজন হারানোর বেদনা — যাদের জানতাম, চিনতাম এবং যাদের সঙ্গে কাজ করেছি। অন্যদিকে এই ভেবে স্বস্তি যে অনেক পরিচিত বন্ধু-বান্ধব সুহৃদ এই দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েনি। তারা ওই সময় অন্যত্র নিরাপদে ছিল। একদিকে যে সব উর্দি পরা সান্ত্রী শহীদ হয়েছেন উগ্রপন্থীদের গুলিতে তাঁদের কথা ভেবে মন ভারাক্রান্ত। অন্যদিকে তাজ ও ওবেরয় হোটেলের সেই সকল নির্ভীক কর্মী যারা নিজেদের কর্তব্যের গণ্ডি পেরিয়ে অসংখ্য অতিথির জীবন রক্ষা করেছেন নিজেদের নিরাপত্তাকে অগ্রাহ্য করে, সেই অখ্যাত বিস্মৃত বীরদের প্রতি মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসছে।

দুর্ভাগ্যবশত, দুঃখ, স্বস্তি, গৌরব, অশ্রু সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় এক ভয়ঙ্কর অদম্য ক্রোধ তাদের প্রতি যাদের অসাবধনাতায় ও কর্তব্যের অবহেলায় এই রক্তাক্ত হত্যালীলা ঘটল এবং অযথা অনেক নিরীহ মানুষের প্রাণনাশ হল। এই নারকীয় কাণ্ডের পিছনে পাকিস্তানের হাত দেখা অনেকটা একথা বলার মতো যে, অভিশপ্ত এই কলিযুগে পাপ অসহনীয় মাত্রায় বেড়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং প্রায়ই অভিযোগ করে থাকেন যে, পাকিস্তানে কিছু দুর্বৃত্ত ভারতের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজকর্মে লিপ্ত। কথাটা অনস্বীকার্য হলেও নতুন কি? ভারত বিদ্বেষের বয়স অন্তত ৬০ বছর। এটা সহজেই অনুমেয় যে যতদিন পাকিস্তান থাকবে ততদিন এই বিদ্বেষও থাকবে। এটাও আশ্চর্যের নয় যে এর পিছনে আই এস আই-এর সক্রিয় মদত আছে। কিন্তু এই মদতও বিগত ৩০ বছর ধরে আছে। আই এস আই-এর প্রতিনিধির হাতে নাশকতামূলক কাজকর্মে পাকিস্তানের জড়িয়ে থাকার প্রামাণিক তথ্য তুলে দেওয়াটা দাউদ ইব্রাহিমকে তার হাতে তার কুকীর্তির প্রমাণ সরাসরি তুলে দেওয়ার মতোই হাস্যকর। লেঃ জেনারেল আহমেদ সুজা পাশা যা দেখলে অভিভূত হবেন তা পাকিস্তানের উগ্রপন্থী কার্যকলাপ। ভারত কতটা জানে তা দেখে নয়, কতটা জানে না এবং ধারণা করতে পারে না তাই দেখে।

পাকিস্তান দোষারোপের মূল কেন্দ্র টার্গেট করলে যে মূল প্রশ্ন থেকে মানুষের লক্ষ্য সরিয়ে দেওয়া হয় তা হল — আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর সুরক্ষার জন্য এতদিনে কী করেছে? অদ্ভুত ব্যাপার হল, আক্রমণের ৪৮ ঘন্টা পরে আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা জানতে পেরেছে যে এই হামলার ছক ছ'মাস ধরে করা হয়েছিল। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে এই তথ্য আগে জানা যায়নি। লজ্জার বিষয় যে এটিএস-কে কোনও ধরনের আক্রমণ মোকাবিলায় পরিকল্পনার সহায়কযোগ্য সমর্থন দেওয়া হয়নি। লজ্জার বিষয় যে এন এস জি ও নৌবাহিনীর সিপাহিদের তলব করতে হয়েছে। লজ্জার কথা যে মুম্বই এটিএস-এর শীর্ষস্থানীয় কর্তারা সবাই নিহত হয়, কারণ গোড়ায় অনুমান করা হয়েছিল যে লিওপোলড কাফের হত্যাকাণ্ড কোনও সাধারণ সমাজবিরোধীদের মধ্যে পরস্পর বিবাদের জের। একটুও তথ্য থাকলে গোয়েন্দা বাহিনীর সতর্কতায় অন্ততঃ ২০০টি প্রাণ এবং ১৭ জন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের জীবন রক্ষা পেত। দাবি করা হয়েছে যে, তিন দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এবং অত্যন্ত দ্রুত জোরালো ও অকাট্য প্রমাণ যোগাড় করা হয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। কিন্তু এটাই তো প্রথমবার নয়। ভারতও কিছু সুইজারল্যাণ্ড নয় যেখানে পুলিশ কেবল আর্থিক কেলেঙ্কারী, বেআইনি অনুপ্রবেশ ও অতি দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর অপরাধেরই তদন্ত করে। ভারত সবসময়ই উগ্রপন্থীদেরর শিকার। মুম্বাইও সবসময় নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যস্থল। আমাদের ওপর অতর্কিতে হামলার পূর্বাভাস যে আমরা পাই না। এর থেকে বোঝা যায় যে আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা হয় অক্ষম এবং অযোগ্য, না হয় তো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পালাবদলের অঙ্ক ছাড়া কিছুই তাদের কাছে বিবেচ্য নয়। সত্যের মোকাবিলা করার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। কিন্তু অপ্রিয় হলেও মানতে হবে যে মুসলমান যুবকদের অন্ন সংস্থানের ক্ষেত্রে উগ্রপন্থী সংগঠনগুলি দিশারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। আজ যদি ১০ জন মুজাহিদিন ৬০ ঘন্টা ধরে ভারতের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্রকে সন্ত্রাসকবলিত করে জনজীবন বিপর্যস্ত করতে পারে, কল্পনা করুন ৫০০০ জন কী সাংঘাতিক ক্ষতি করতে সক্ষম। অতএব, লস্কর-এ-তৈবা-র এই ফিদাইন হামলা মুসলিম বেকার যুবসমাজের কাছে ইতিবাচক বার্তা বৈকি! মাননীয় ডঃ মনমোহন সিং ও মাননীয় শিবরাজ পাটিল কি তা জানেন না? মুম্বাইয়ের আতঙ্কে সন্ত্রাসবাদীরা মোটেই শিউরে উঠবে না। তারা তাদের প্রচার আরও জোরদার করবে এবং নিজেরা সাহসিকতার প্রতিযোগিতায় কোমর বেঁধে নামবে। আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাও আজ কারও অজানা নেই। আমরা হয় দৃঢ় পদক্ষেপে ও কঠোরভাবে সন্ত্রাস দমনে সক্রিয় হতে পারি, নাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে সন্ত্রাস দমনে আমরা যেহেতু অক্ষম, সেহেতু ‘র’ এবং আই বি’র কাজ বিদেশের কোনও দক্ষ গোয়েন্দা সংস্থাকে দিতে হবে। যেমন মেসাদ বা এম-১৬ বা সি আই এ। এটা নির্ভর করবে আমাদের পছন্দের ওপর। অন্তত হোটেলে বা ভোজনশালায় উগ্রপন্থীর গুলিতে নিহত হওয়ার চেয়ে এই ব্যবস্থা অবশ্যই কাম্য।

আমাদের সেনারা অত্যন্ত সাহসী এবং দক্ষ। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী মোকাবিলা ঠিক তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর বহন করে না।

ইংরেজি সম্প্রচার মাধ্যমগুলি অনবরত রাজনীতিবিদদের দায়ী করে চলেছে। যখনই কংগ্রেস একটু বেকায়দায় পড়ে, এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়। আমাদের শাসনব্যবস্থায় সামরিক আইন বা পুলিশি আইন সংবিধানসম্মত নয়। অতএব এই সমস্যার সমাধান সূত্র আমাদের বার করতেই হবে। বিদ্রূপ, নিন্দা, সমালোচনা ভাল। তার মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগ ক্ষতিকারক। মনমোহন সিংয়ের সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কংগ্রেসকে এবং বিশেষত যে উদ্ধত মহিলা এই ব্যর্থতার দায় শুধুমাত্র শিবরাজ পাটিলের ওপর চাপিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিতেই হবে। সেইসঙ্গে এমন এক সরকারকে নির্বাচিত করতে হবে যে সরকার সন্ত্রাস দমনে বদ্ধ পরিকর ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় দৃঢ় সংকল্প।

নবনির্বাচিত সরকার যথার্থ তখনই হবে যখন পুরনো, বস্তা পচা আদর্শের ও নীতির জমে ওঠা জঞ্জাল পরিষ্কার করে কার্যকরী নীতি অনুসরণ করবে যা ফলপ্রসূ হবে। মুম্বাই মনমোহন সিং সরকারের অপদার্থতা অনাবৃত করেছে। মনে রাখতে হবে, ভারতের মিত্ররা যেমন দেখছে ঘটনাস্রোত, ভারতে শত্রুরাও তেমনই নজর রাখছে।

(লেখক একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। পাইওনীয়র-এর সৌজন্যে)

> “ **মনমোহন সিংয়ের সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কংগ্রেসকে এবং বিশেষত যে উদ্ধত মহিলা এই ব্যর্থতার দায় শুধুমাত্র শিবরাজ পাটিলের ওপর চাপিয়েছেন, তাদেরকে শাস্তি দিতেই হবে। সেইসঙ্গে এমন এক সরকারকে নির্বাচিত করতে হবে যে সরকার সন্ত্রাস দমনে বদ্ধ পরিকর ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় দৃঢ় সংকল্প।** ”

অজ্ঞতার আস্পর্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। চাঁদে প্রেরিত জাতীয় পতাকায় কেন সংস্কৃত শ্লোক লাগানো হয়েছে তা নিয়ে এবার প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলো মোল্লা-মৌলবীদের মুখপত্র মীযান। তাদের যুক্তি পতাকায় কোরাণের সূরা তো হতে পারতো তা না হয়ে কেন সংস্কৃত শ্লোক।

ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম হিন্দুরাষ্ট্রের বিতর্ক উস্কে এক শ্রেণীর ভারতীয় পরম্পরা বিরোধীদের নিয়ে মৌলবীরা এবার মাধবন নায়ার এবং আব্দুল কালামের সক্রিয় বিরোধিতায় সরব হয়েছে। শুধু তাই নয়, কৌশলে বিভাজন নীতি কার্যকরী করতে বাইবেল, গ্রন্থসাহেব, ত্রিপিটকের শ্লোক কেন তুলে ধরা হল না তা নিয়েও স্থানে স্থানে মিটিং মিছিল শুরু করেছে ইসলামিক বৌদ্ধারা।

যদিএ এইসব করার আগে মাধবন নায়ার অনেক আগেই বহুবার বলেছেন, প্রাচীন ভারতের ঋষি-মুনিরা যে মূল্যবান চিন্তন তথা গবেষণা করে গেছেন, ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনা অতীতের সেই প্রবাহ থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও দূরে এগোতে পারবে, আর সেই কারণে প্রাচীন শ্লোক থেকেই আমাদের উদ্ধৃতি বা লোগো নেওয়া হয়। যা একান্তভাবে আমাদের মৌলিক তত্ত্বের পরিচায়ক। আমাদের গর্বের বিষয় বস্তু। হঠাৎ করে চাঁদে সংস্কৃত শ্লোক কেন — এহেন বিতর্ক জাগিয়ে তোলা এক নোংরা মানসিকতারই পরিচায়ক বলে বিদ্বৎজনদের অভিমত।

এই সময়

আমেরিকার ফায়দা

ভারতসহ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে চীন যে শিশুখাদ্য হিসাবে দুধ (বেবিফুড) রপ্তানী করেছে সেই দুধ পান করে চীনের ৬টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৯৪ হাজার শিশু। দুধের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ মেলাইন। গত সেপ্টেম্বর মাসেই এই শিশু খাদ্য দুর্নীতির তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসায় বিশ্ব জুড়েই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনেক দেশ চীনের দুগ্ধজাত দ্রব্য আমদানি অথবা বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই সুযোগে চীনে আমেরিকা তার অফিস খুলছে। বি বি সি সূত্রে জানা গেছে, চীন তাদের তিনটি বড় শহরে মার্কিন ফুড এ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে অনুমতি দিয়েছে। উদ্দেশ্য — রপ্তানীযোগ্য চীনা খাদ্যদ্রব্য-এর মান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

দরদী চীন

নেপালের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে চীন নেপালকে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। যে সময়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী নেপাল সফরে তখনই চীন এই আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করে। উল্লেখ্য, নেপালে বর্তমানে মাওবাদী দলের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায়। অর্থসাহায্য ঘোষণার পরপরই চীনা বিদেশমন্ত্রী ইয়াং জিয়েচি তিন দিন নেপাল সফর করেন।

ঘর শত্রু

খোদ সেনাবাহিনীর এক জওয়ানকে ইরানের হয়ে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য দশ বছরের কারাদণ্ড দিল বৃটিশ সরকার। তার নাম ড্যানিয়েল জেমস্। জেমস্ আফগানিস্তানে অবস্থানরত বৃটিশ বাহিনীর কম্যাণ্ডারের অধীনে কাজ করতেন। কিন্তু তিনি ২০০৬ সালে ইরানকে ন্যাটো বাহিনীর গোপন খবর সরবরাহ করে ধরা পড়ে যান। জেমস্ কমাণ্ডার ডেভিড রিচার্ডস্-এর দোভাষীর কাজ করতেন। তার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের অধীনে গোপন এবং স্পর্শকাতর তথ্য শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। ২০০৬ সালেই জেমস্কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আফগান সরকার এবং অন্যান্য মিত্রশক্তির মধ্যে আস্থাভঙ্গের দায়ে বিচারপতি জাস্টিস রোডরিক ইভানস্ ড্যানিয়েল জেমস্কে দণ্ডিত করেন।

নাম মাহাত্ম্য

শুধু নাম রাখলেই পুরস্কার। হ্যাঁ এমন অদ্ভুত ঘোষণা করেছে ইতালির একটি রাজনৈতিক দল। তাদের ঘোষণা অনুযায়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির ফ্যাসিবাদী নেতা ব্যানিটো মুসোলিনীর নামে কোনও দম্পতি যদি তাঁদের সন্তানের নাম রাখেন তাহলেই গরম গরম পুরস্কার। তাছাড়াও রয়েছে খাদ্য, পোশাক সামগ্রী ইত্যাদি। এই উদ্যোগের খরচা বহন করবে মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী দলের উত্তরসূরী এম এস আই ফিয়াম্বা ট্রাইকোলার পার্টি।

কাঠগড়ায় পাকিস্তান

সাম্প্রতিক মুম্বাই বিস্ফোরণই নয়, সন্ত্রাসবাদ, অস্ত্র চোরাচালান, সংবিধান অবমাননা তথা শান্তি নষ্টের মতো অপকর্মের জন্য শুধু ভারতের কাছেই নয়, বিশ্বের কাছেও মাথা ব্যাথার কারণ পাকিস্তান। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পাকিস্তান সম্পর্কে এমনই অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সেক্রেটারি অব স্টেট মেডেলিয়াইন আলব্রাইট। এই সমস্ত অভিযোগের জ্বলন্ত প্রমাণ মার্কিন গুপ্তচর সংস্থাগুলির কাছে রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। আগামী দিনে বারাক ওবামা এই ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কৌশলে আঘাত

গাঁ বাঁচিয়ে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গকে আঘাতকরতে উদ্যোগ নিয়েছে ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলি। উচ্চ পর্যায়ের গোয়েন্দা আধিকারিকদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মাওবাদী, কে এল ও ইত্যাদিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে লোক ঢুকিয়ে এবং তাদের উস্কে অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিয়ে মারাত্মক ধরনের বিস্ফোরণ করার ছক কষছে হরকত-উল-মুজাহিদিন ও সিমির মতো কুখ্যাত সংস্থাগুলি। এতে সরাসরি যেমন ইসলামি সম্প্রদায়ের উপর মানুষের ক্ষোভ হবে না, অন্যদিকে অন্তর্দ্বন্দ্বে জেরবার হয়ে উঠবে পশ্চিমবঙ্গ।

গোড়ায় গলদ

খোদ সরকারি কর্তাদেরই রাজ্য ও কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্প সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাটুকুও নেই। গোড়ায় গলদের এই চিত্রটা স্বয়ং শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন নিজেই তুলে ধরেছেন। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোনও ধারণা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে শিল্পমন্ত্রী একটি সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা চালান। সমীক্ষায় প্রকাশ শুধু সাধারণ মানুষ নয়, সরকারি আমলাদেরই প্রকল্প সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেই। উন্নয়নের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের এই হাল দেখে স্বাভাবিক ভাবেই বিস্ময়ে অনেকে।

ঠগ বাছতে....

আলিমুদ্দিন কর্তাদের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। রাত দিন কেলেঙ্কারির শেষ নেই। এর মধ্যে গোদের ওপর বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে নেতা-কর্মীদের দুর্ব্যবহার। সম্প্রতি বিরোধী নেতা-কর্মীদের মারধরের ঘটনায় সিপিএমের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক অমিয় পাত্রসহ সাত নেতাকর্মী অভিযোগের কাঠগোড়ায়। ফলে বাঁকুড়ার লাল দুর্গে এখন ঠগ বাছতে গা উজাড় হয়ে যাওয়ার অবস্থা। সিপিএম বিধায়ক মনোরঞ্জন পাত্রসহ লোকাল কমিটির নেতাকর্মীরাও এই ঘটনায় যুক্ত। বিরোধীদের ড্যাশ ধোলাই দিতে গিয়ে এখন নিজেরাই বেকায়দায় পড়েছে।

ভারতকে একাই লড়তে হবে

(১ পাতার পর)

বাংলাদেশ আদতে দুটি সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র। এই দুই রাষ্ট্রেরই মূল লক্ষ্য ভারতকে দুর্বল করা। এদের বিরুদ্ধে ভারতকে একাই লড়তে হবে। প্রাচীন ভারতে একদা শক, হুন, মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ভারত আপন শক্তিতেই লড়েছিল। ভারতের গুপ্ত সম্রাটরা বিদেশি হানাদারদের রুখে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১২০০ বছর ধরে মুসলিম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু ভারত একাই লড়েছিল। ভারতবাসীরা জিততে পারেনি একমাত্র অনৈক্যের কারণে। ১৯৭০-২০০৪ এই সময়ের ভারতে জঙ্গি হামলার তথ্য মার্কিন গবেষকরা জানিয়েছেন। কিন্তু সর্বাধিক জঙ্গি হামলা হয়েছে গত চার বছরে। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যই ইসলামি জঙ্গি হামলার শিকার হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রের অতি দুর্বল কংগ্রেস সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। মুম্বাইয়ের সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার পরে জনরোষ প্রত্যক্ষ করে এখন কংগ্রেস সরকার স্বীকার করছে যে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতি আছে। সবচেয়ে বড় গাফিলতি হচ্ছে জঙ্গি দমনের বিষয়টি রাজ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া। রাজ্যের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের। কিন্তু জঙ্গিরা হামলা চালাচ্ছে দেশ জুড়ে। তাই জঙ্গি দমন কোনও বিশেষ বিশেষ রাজ্যের হতে পারে না। যেমন, ভারতের পশ্চিম সীমান্তে পাকিস্তান আক্রমণ চালালে তা পশ্চিমের রাজ্যগুলির সমস্যা বলে গণ্য করা হয় না। বহিরাগত পাক ও বাংলাদেশি জঙ্গি হানাদারদের হামলাকেও ভারতের উপর আক্রমণ বলে মনে করা দরকার। জাতীয় সুরক্ষা নীতিও সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী মুম্বাই হামলার প্রেক্ষিতে ঘোষণা করেছেন যে ১০ ডিসেম্বর সংসদের অধিবেশন শুরু হলে সন্ত্রাস দমনে নতুন একটি কেন্দ্রীয় আইন আনা হবে। প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে বর্তমানে চালু জাতীয় সুরক্ষা আইনটি সন্ত্রাস বন্ধ করতে যথেষ্ট কার্যকর নয়। তাই আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই) গোয়েন্দা সংস্থার অনুকরণে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করা হবে।

এই সংস্থার একমাত্র কাজ হবে জঙ্গিদের খুঁজে বার করা এবং তাদের হামলার ছক বানচাল করা। এক কথায়, ভারতের বুকে জঙ্গি দমনই এই বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে। প্রস্তাবিত এই সংস্থার গোয়েন্দাদের তদন্ত এবং গ্রেফতারের জন্য কোনও রাজ্য সরকারের আগাম অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হবে না। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের দ্রুত বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠনেরও প্রস্তাব আছে।

আমাদের এখন অপেক্ষা করতে হবে এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত দুর্বল মুসলিম তোষণকারি কংগ্রেস সরকার কার্যকর করবে কিনা দেখার জন্য।

গোরক্ষা আন্দোলনে মুসলিমরা

(১ পাতার পর)

না করতে আবেদন জানিয়েছেন বিহারের রাজ্যমন্ত্রী অধ্যাপক শামশের।

মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের সর্বভারতীয় সংগঠক সংযোজক গিরিশ জুয়াল বলেন, ভারতে গোহত্যা বে-আইনি। তাই সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে আগামী বছর (২০০৯)-কে 'গো-চেতনাবর্ষ' হিসাবে সারা ভারতে পালন করা হবে। দেশে সমস্ত বৈধ-অবৈধ সকল প্রকার কসাইখানা (যেখানে গরুকে কুরবানি দেওয়া হয়)-কে বন্ধ, গরুকে জাতীয় পশুর মর্যাদা দান, গোরক্ষার জন্য সরকারি তরফে পৃথক একটি মন্ত্রালয় তৈরিসহ বেশ কয়েকটি দাবি আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সারা দেশের ২২টি রাজ্যে এই ধরনের আন্দোলন চলছে বলে তিনি জানান। মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের উত্তর-পূর্ব ভারতের মহিলা সেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত ইশরত খাতুন বলেন, পশ্চিমবঙ্গে গোহত্যা এবং গরু পাচার বন্ধে পুরোপুরি ব্যর্থ রাজ্যের কমিউনিস্ট সরকার। পাঁচ লক্ষ মুসলিমের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি স্মারক লিপি সংগঠনের পক্ষ থেকে ৭ নভেম্বর ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়েছে। কলকাতার রাজাবাজার, মেটিয়াবুরুজসহ বেশ কয়েকটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় 'গো-হত্যা' বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন মহিলা সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী ইশরত খাতুন। এই একই বিষয় নিয়ে ৫ ডিসেম্বর সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে এই মর্মে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়েছে। গোরক্ষা আন্দোলনে মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গের সক্রিয় সদস্য সুফিনিয়াজী মহম্মদ জাহাঙ্গীর, সংযোজক ইমানুল হকসহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের প্রমুখ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্যে পুলিশকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লাগানো হচ্ছে

নিশাকর সোম

মুম্বাইতে জঙ্গি হানার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছে, পশ্চিমবঙ্গে তথা কলকাতার এ-রকম ঘটনা ঘটার প্রতিরোধী ব্যবস্থা কি যথেষ্ট? নিকট অতীতে কলকাতার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য অন্য রাজ্যের পুলিশ এসেছিলেন এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে জঙ্গিদের হত্যা পর্যন্তও করা হয়েছিল। তখনই প্রমাণিত হয়ে গেছিলো এরাজ্যের গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা। শুধু এক্ষেত্রেই নয়, নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর এবং জঙ্গলমহল-লালগড় নিয়েও পুলিশের সংবাদ সংগ্রহের ব্যর্থতা প্রকটিত হয়েছিল। এমনকী যে "মাওবাদী" নিয়ে এতো চিৎকার হয়েছিল — সেই মাওবাদীদের সম্পর্কে কোনও আগাম খবর কি গোয়েন্দা দপ্তর দিতে পারছে? শোনা যায়, বুদ্ধদেববাবু জ্যোতি বসুর আমল থেকেই রাজ্যের পুলিশ কর্তাদের পোস্টিং-এর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি পুলিশ মহলে একটি গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেন। যাঁরা নাকি বুদ্ধবাবুকে মনগড়া সংবাদ দিতেন। এই সময়েই নাকি স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের সোর্স-মানিও বন্ধ করে দেওয়া হয় যুক্তি দেওয়া হয়। পার্টির লোকজন সমস্ত খবরাখবর দেবেন। যদিও "স্বস্তিকা" পত্রিকার ধারে কাছে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের মতোন দেখতে বেঁটে কালো রঙ, ঠোঁটে এবং হাতের আঙুলে শ্বেতী আছে — এমন ওয়াচার অফিসের পাশে এবং বেশ মোটা গোঁফধারী লম্বা ফরসা ওয়াচার অফিসের উল্টো দিকের গলি থেকে ওয়াচ করে। বুদ্ধবাবু আপনি একাজে এঁদের সময় নষ্ট করতে না দিয়ে কলকাতার "কয়েকটি বিশেষ এলাকার খবর আনার ব্যবস্থা ভবিষ্যতে করলে রাজ্যের মঙ্গল হবে। বুদ্ধবাবু জেনে রাখুন, বিজেপি এবং আর এস এস দেশের সার্বভৌমত্বের এবং নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী। এটা বুদ্ধবাবুরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণের জন্য করছেন।

সিপিএম বামফ্রন্টের শরিকদের না-জানিয়ে বিধানসভায় পেশ না করে আম্বানিদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমতি দিয়েছে। এর প্রতিবাদে আর এসপি'র ছাত্র সংগঠন আইন-অমান্য আন্দোলন করেছে। এই আইন-অমান্যে ক্ষিতি গোস্বামীর কন্যাও গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। সিপিএম শরিকদের অন্ধকারে রেখে নিজেদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে যুক্তমোর্চার মূল মর্মকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। একদিকে সিপিএম বামঐক্য জোরদার করার কথা বলছে, আবার সেই ঐক্যকে তোয়াক্কা না করে একক অহংকারে চলতে থাকে। এর ফল হাওড়া পুরসভার নির্বাচনে পাওয়া যাবে। শরিকদলের কর্মীরা সিপিএম-এর বিরুদ্ধেই ভোট দেবেন।

সিপিএম লালগড় নিয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়ে রয়েছে। এই সমস্যা তথা জনজাতি সাঁওতাল সমস্যা নিয়ে সর্বদলীয় সভা হওয়া দরকার। কারণ এই সমস্যা এবং দার্জিলিং সমস্যা গোটা রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। তাই এই সমস্যা সমস্ত রাজনৈতিক দলকে জানাবার জন্য সর্বদলীয় সভা করা একান্তই প্রয়োজন।

নবজাতক একটি বাংলা দৈনিকে দেখলাম, সিঙ্গুরে কিছু সাংবাদিকদের সিপিএম কর্মীরা বাঁশ পেটা করে মেরে আহত করেছে। এই আক্রমণের সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল। হামলাকারীদের চলে যাবার পর আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই আহতদের মধ্যে ছিলেন 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার অবসর প্রাপ্ত সাংবাদিক বরুণ দাশগুপ্ত। বরুণবাবু আজকাল পত্রিকাতেও ছিলেন। তিনি 'আর সিপিআই' দলের কর্মী ছিলেন এবং দ্বিতীয় গান্ধীর সহকর্মী ক্ষিতিশ দাশগুপ্ত'র ভ্রাতুস্পুত্র। সিপিএম কর্মীরা বস্তুত তাঁদের ক্যাম্পের অনুগামীকেই পেটালেন! এটা যুক্তফ্রন্টের প্রয়াত মন্ত্রী নেতা সুধীন কুমারের সচিবের কাজ করেছিলেন। বরুণবাবুর পারিবারিক পরিচয় হল — বাংলার গান্ধী নামে খ্যাত এবং মহাত্মা গণতন্ত্র এবং মানবিকতার বিরুদ্ধে অভিযান। সিপিএম-এর বন্ধু পার্টিরা এতে সরে যাবে। মিহির বাইন কি বলেন?

> **"সিপিএম লালগড় নিয়ে ল্যাজে-গোবরে হয়ে রয়েছে। এই সমস্যা তথা জনজাতি সাঁওতাল সমস্যা নিয়ে সর্বদলীয় সভা হওয়া দরকার। কারণ এই সমস্যা এবং দার্জিলিং সমস্যা গোটা রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। তাই এই সমস্যা সমস্ত রাজনৈতিক দলকে জানাবার জন্য সর্বদলীয় সভা করা একান্তই প্রয়োজন।"**

বিতর্কিত নেতা মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী আবার একটি ফানুস ছেড়েছেন, যেমন বলেছিলেন সিঙ্গুরে অক্টোবর মাসের মধ্যে গাড়ির কারখানা খুলে যাবে এবং মউ স্বাক্ষরিত হবে। এবার তিনি বলছেন, কলকাতায় "চলমান রাস্তা" তৈরি হবে। জার্মান কোম্পানি করবে। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হবে। ব্যবস্থা নাকি সম্পূর্ণ। যদি হয় সুভাষ গোষ্ঠীরই পোয়াবারো।

অন্যরকম

বেটা হো তো অ্যায়সা

সংসারের বোঝা টানতে টানতে কবে যে নিজেই নিজের কৈশোরটা গলা টিপে মেরে ফেলেছে সে খবর মিঠুন রুদ্রপাল নিজেও কোনও দিন ঠাহর করতে পারেনি। সংসারের হাল ধরতে গিয়ে সখ আহ্লাদটাও অকালে বিসর্জন দিতে হয়েছে তাকে। মাত্র ১২ বছর বয়সেই পাকা সংসারীতে পরিণত হয়েছে মিঠুন, নিজের পড়াশোনার খরচটাও নিজেকেই চালাতে হয়। আর তাছাড়া উপায়ই বা কী আছে। বাবা বীরেন্দ্র রুদ্রপাল দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী বিকলাঙ্গ। ছেলের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দেখেও অসহায় তিনি। ছেলের খাটুনির ভাগীদার হবার শক্তিটুকুও ভগবান ছিনিয়ে নিয়েছেন। মা'র অবস্থা তো আরও খারাপ। মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে তিনিও পড়ে আছেন। তাই শুধু সংসারের হাঁড়ি চাপানো নয়, মা-বাবা'র শরীরের প্রতিও নজর রাখতে হয় মিঠুনকে। মাত্র এই বয়সে সংসারের অভিজ্ঞতাটা তার কম হয়নি। অভিজ্ঞতার দিক থেকে মিঠুনও যেন শরৎচন্দ্রের কাঙালী'র মতোই সংসারের অভিজ্ঞতায় বুড়ো হয়ে গেছে। দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের যোগাড় করতে এই বয়সেই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করতে হয় তাকে। আগরতলার (ত্রিপুরা) কুমোরপাড়ার মিঠুনকে তাই দিন-রাত এক করে মাটির পাত্র তৈরিতে ব্যস্ত থাকতে হয়।

এই বয়সে তারই বয়সের ছেলেরা নিজেদের সখ-আহ্লাদ পূরণে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মিঠুনের নিজের জন্য ভাবনার একদন্ডও সময় নেই। বরং এই বয়সে মিঠুন

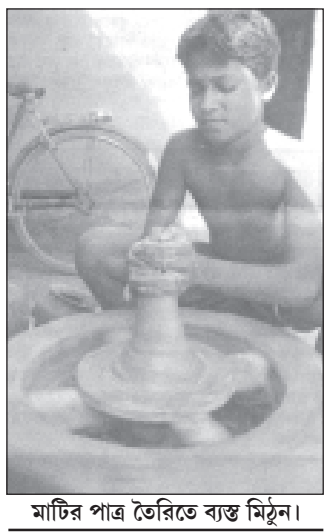

মাটির পাত্র তৈরিতে ব্যস্ত মিঠুন।

মা-বাবা'র চোখের জল মুছতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। আর এই কাজে সে তাবড় তাবড় যুবকেরও কান কেটে দিতে পারে। মিঠুনের কী এমনই বা বয়স। এই বয়সে সাধারণত গা থেকে মাতৃদুগ্ধের গন্ধ যায়না। ভূতের ভয়ে মায়ের আঁচলে লুকিয়ে পড়ার বয়স তার। কিন্তু মিঠুন এই হিসাব করে চুপ করে বসে থাকেনি। অসহায় মা-বাবা'র মুখে দু'মুঠো ভাত তুলতে একেবারে আদাজল খেয়ে সে সংসারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘুরন্ত চাকের ওপর চাপানো কাদা থেকে যা রোজগারপাতি হয়, তাতে সংসার চলে না। তাই এরই মাঝে পার্ট-টাইম কাজ করতে হয় তাকে। সময়ের ফাঁকে পাড়ার দোকানে একটু আধটু কাজ করে আরও কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে সে। শুধু তো উনানে হাঁড়ি চাপানো নয়। মা-বাবা'র জন্য ওষুধের ব্যবস্থাটাও তাকেই করতে হয়। মা ওষুধ পেলে একটু ভালো থাকেন। তিনি নিজেও সে কথা বোঝেন। যতই হোক মা বলে তো কথা।

পূর্জা-পার্বনের দিনগুলিতে মিঠুন আরও বেশি পরিশ্রম করে। স্কুলের ছুটির আনন্দে গা না ভাসিয়ে এই সময় সে কিছু টাকা জমিয়ে রাখে। পদ্মানদীর মাঝি'র হারু কানু'র মতোই। মিঠুনও এই সময় ঘরে বসে থাকে না। কচি কচি আঙুল দিয়ে পাত্র তৈরি করে দেখিয়ে দেয় সে এই বয়সেও কম যায় না। বয়সে বালক হলেও যুবকের মতো হিম্মত তার। মিঠুন তার অসহায় অবস্থার জন্য কোনওদিন কারও কাছে হাত পাতেনি। অসহায় মা বাবাও তাই মনে মনে ভাবেন বেটা হো তো অ্যায়সা।

দেবোত্তর সম্পত্তি দখলের প্রতিবাদে কয়রায় হিন্দুদের বিক্ষোভ মিছিল

সংবাদদাতা।। জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়ো কাগজ তৈরি করে হিন্দু দেবতার নামে দেবোত্তর সম্পত্তি দখল করতে সন্ত্রাসীচক্র এখন বাংলাদেশের খুলনা জেলার কয়রা থানা এলাকার নেতৃস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের নামে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে চলেছে। মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার সহ দেবোত্তর সম্পত্তি জোরপূর্বক দখলের প্রতিবাদে গত ৩ ডিসেম্বর কয়রাতে সহস্রাধিক সংখ্যালঘু (হিন্দু) নারী-পুরুষ বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি প্রথমে কয়রা থানার সামনে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলী আজম খান তাঁদের কথা শোনেন এবং উভয় পক্ষসহ উপজেলার গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা করেন।

অভিযোগ , উপজেলার কয়রা মৌজার ৬৮৪ নং এস ও খতিয়ানভুক্ত প্রায় ৮০ বিঘা সম্পত্তি সি এস রেকর্ডীয় মালিক কর্তৃক দানসূত্রে হিন্দু দেবতা শ্রীশ্রী গোবিন্দ জিউ ঠাকুর নামীয় দেবোত্তর সম্পত্তি। হিন্দুদেরই দেবোত্তর সম্পত্তির আর এস এবং এস এ রেকর্ডীয় মালিক হিসাবে তারা বাংলা ১৪১৪ সন পর্যন্ত সম্পত্তির কর খাজনা পরিশোধ করেছেন। হিন্দুদের অভিযোগ, এলাকার ভূমিদস্যু হিসাবে পরিচিত ৫ নং কয়রার জববার সরদার এবং নাজমুচ্ছাদাত সরদার এই সম্পত্তি ভোগ দখল করতে নিজের নামে এবং নিকট আত্মীয়সহ গ্রামবাসী কয়েকজনের নামে সম্পত্তি নিলামে ক্রয় দেখিয়ে মালিকানা দাবি করছেন। সম্পত্তি দখলের জন্য স্থানীয় হিন্দুদের ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করে উপজেলা সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সি আর ৩৪৬/০৮ এবং ৩৫০/০৮ দুটি মিথ্যা মামলা দায়ের করে ভূমিদস্যুরা। এরই প্রতিবাদে উপজেলায় হিন্দুদের মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়। মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশে নেতৃত্ব দেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল এবং উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির নেতৃবৃন্দসহ আইনজীবীরা। ৬ নং কয়রা শ্রী শ্রী গোবিন্দ জিউ ঠাকুর মন্দির কমিটির সভাপতি গোষ্ঠবিহারী রায় এবং ৬ নং কয়রা গ্রামের ইউপি মেম্বার হরেন্দ্রনাথ সরদার জানান, তাঁরা এই সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে ভোগদখল এবং মন্দিরের কাজে সম্পত্তির উৎপাদিত ফসল ব্যবহার করে আসছেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, চলতি বছরে আমন ধান উৎপাদন করার লক্ষ্যে সম্পত্তি চাষ করার সময় ৫ নং কয়রার নাজমুচ্ছাদাত একদল ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে চাষ করতে বাধা দিলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দেখা দেয়। কয়রা থানার পুলিশ ঘটনা স্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কয়রার ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ সম্পত্তি দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ডভুক্ত আছে এবং দেবোত্তর সম্পত্তি হিসাবে কর ও খাজনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল বলেন, 'ভূমিদস্যুরা জোরপূর্বক কখনও জমির ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার এবং মিথ্যা মামলার ভয়ে সহস্রাধিক সংখ্যালঘু পরিবার আতঙ্কগ্রস্ত রয়েছেন।'

নারায়ণগঞ্জের মেয়রকে মূর্তি তৈরি বন্ধের হুমকি

সংবাদদাতা ।। নারায়ণগঞ্জ শহরে নির্মাণাধীন মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যকে মূর্তি আখ্যা দিয়ে নির্মাণকাজ বন্ধ করতে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ডাঃ সোলিনা হায়াত আইভীকে উকিল নোটিশ পাঠিয়েছে নারায়ণগঞ্জ উলামা পরিষদ।

উলামা পরিষদের পক্ষে অ্যাডভোকেট হাসান শাহরিয়ার খান আসাদ গত ৩ ডিসেম্বর সেলিনা হায়াত আইভীকে পাঠানো নোটিশে উল্লেখ করেন, আপনি মূর্তি নির্মাণ বন্ধ করবেন নতুবা নারায়ণন এয়ারপোর্টের ন্যায় ঘটনার জন্ম হবে। ...ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার কারণে আপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী আলেম সমাজ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করবে।'

পৌর মেয়র সেলিনা হায়াত আইভী উকিল নোটিশ পাওয়ার কথা স্বীকার করে জানান, বিষয়টি তিনি জেলা পুলিশ সুপারকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করেছেন।

এদিকে নারায়ণগঞ্জের ৩৬টি প্রগতিশীল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা এক সভায় মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যকে মূর্তি আখ্যাদানকারী উলামা গোষ্ঠীর হিংসাত্মক কার্যক্রম প্রতিহত করার আহ্বান জানান।

সভায় বক্তব্য রাখেন নারায়ণগঞ্জ নাগরিক কমিটির সভাপতি এ বি সিদ্দিক, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সভাপতি রফিউর রাবিব, জেলা সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ভবানীশংকর রায়, ওয়ার্কার্স পার্টির শফিউদ্দিন আহম্মেদ, নারায়ণগঞ্জ চারুকলা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শামসুল আলম আজাদ, উদীচীর মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তা প্রমুখ।

রেল সম্প্রসারণে ৯০৬৭ কোটি টাকার ফাণ্ড

সংবাদদাতা ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্রুত রেল সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই সম্প্রসারণ ৯০৬৭ কোটি টাকার-নন্ ল্যাপসেব্ল ফাণ্ড তৈরি হয়েছে। এই উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে উন্নয়ন তহবিলটিতে আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ১১০ কিলোমিটার নতুন লাইন ২০১৪ সালের মার্চ মাসে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। একই সময়ে জিরিবাম থেকে ইম্ফল ৯৮ কিলোমিটার লাইন তৈরীর কাজও শেষ হবে। ২০১১ সালের মার্চ মাসে শেষ হবে লামডিং-শিলচর-জিরিবাম এবং বদরপুর-কুমারঘাট ৩৬৭ কিলোমিটার মিটার গেজ থেকে ব্রডগেজ-এ পরিবর্তনের কাজ। রঙ্গিয়া-মুরকোংসেলেক ৫১০ কিলোমিটার পরিবর্তনের কাজ ২০১২ সালের মার্চ মাসে শেষের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে। ডিমাপুর থেকে কোহিমা ৮৮ কিলোমিটার নতুন লাইন শেষ হওয়ার কথা ২০১৪-র মার্চ মাসে।

অসম ও মেঘালয়ের মধ্যে আজরা থেকে বর্নিহাট ৩০ কিলোমিটার নতুন লাইন শেষ হতে পারে ২০১২-র মার্চ মাসে। মিজোরামে ভাইরাঙি থেকে সাইরাং পর্যন্ত নতুন লাইন ৫১ কিলোমিটার শেষ হতে পারে ২০১৫-র মার্চ মাসে। এই নন্ লেপসেব্ল নর্থ ইস্ট রেলওয়ে ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ড-এর প্রথম প্রকল্পটি এই বছরের জুন মাসে সম্পূর্ণ হয়েছে। এটি হল কুমারঘাট-আগরতলা ১০৯ কিলোমিটার রেল লাইন তৈরির কাজ।

গত ২৯ জুন আগরতলা পর্যন্ত রেল ইঞ্জিন এবং ৫ অক্টোবর থেকে ঐতিহাসিক ও ত্রিপুরাবাসীর আকাঙ্ক্ষিতযাত্রীবাহী রেল চলাচল শুরু হয়েছে। অরুণাচলপ্রদেশ ও সিকিম ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৬টি পার্বত্য রাজ্যই রেলপথে সমৃদ্ধ হচ্ছে এই ফাণ্ড দ্বারা। এতে ২৫ শতাংশ টাকা দেবে রেল মন্ত্রক। বাকী ৭৫ শতাংশ আসবে দেশের কনসোলিডেটেড ফাণ্ড থেকে।

লক্ষ্মী ওরাঁও এ ইউ ডি এফের প্রার্থী হলে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মদত পাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আতর ব্যবসায়ী কোটিপতি বদরুদ্দিন আজমলের দল এ ইউ ডি এফ আগামী লোকসভা নির্বাচনে লক্ষ্মী ওঁরাও-কে তাঁদের দলের প্রার্থী করছে বলে খবর পাওয়া গেছে। লক্ষ্মী ওঁরাও সম্প্রতি বদর-রসিদ-এর অসম ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের দলে যোগ দিয়েছে। লক্ষ্মী ওঁরাও এক বছর আগে সংবাদের শিরোনামে আসেন। লক্ষ্মী ওঁরাও সেই মেয়ে যাকে এক বছর আগে চা-জনজাতি ছাত্র ইউনিয়নের (All Assam Tea Tribe Students Union) আন্দোলনের দিন গুয়াহাটির বেলতলায় একদল যুবক কেবল মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি, প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে আনন্দে নৃত্য করেছিল। জঘন্য ব্যবহারের নিন্দার যে কোনও ভাষা নেই তা স্বীকার করেও ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন এভাবে বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী জনজাতিদের এই ক্ষোভকে উসকে দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদকে চিরস্থায়ী করতে মাঠে নেমেছে। চা-শ্রমিকদের ভোট যদি এ ইউ ডি এফ-এর নিজস্ব 'মুসলমান' থোক ভোট-এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে কংগ্রেস, বিজেপি, অগপ-র পক্ষে তা এক বিপজ্জনক সংকেত।

ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল এভাবে — অসমের চা-বাগানে বিগত দু'শো বছরের বেশি সময় ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উপজাতি সমাজের লোকেরা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে আসছে। তাদের বংশধর বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা হঠাৎ চা-উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন গঠন করে 'জনজাতি' হিসেবে তপশীলভুক্ত হওয়া ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা আদায়ে জঙ্গি আন্দোলনে নেমে পড়ে। গুয়াহাটিতে সেদিন ধর্ণা ও প্রদর্শন ছিল। মিছিল থেকে হঠাৎই কয়েকজন বের হয়ে আশ-পাশের অসমীয়াদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙ্গ চুর-মারধর করে। তারপরই চা-উপজাতি ছাত্রদের মিছিলে চড়াও হয় বহিরাগতরা। লক্ষ্মী ওঁরাওকে বিবস্ত্র করা হয়। এতে জনজাতি ছাত্ররা ক্ষেপে যায়। তাদের সঙ্গে মারপিট বেধে যায়। প্রশাসন কার্ফু জারি করে। সংবাদে জানা যায় যে, আই এস আই-এর স্থানীয় এজেন্টরাই সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু চা-উপজাতি ছাত্রদের সঙ্গে স্থানীয় অসমীয়াদের ঝগড়া মারপিটটা লাগিয়ে দিয়েছিল।

এবছর টোপ গিলে লক্ষ্মী ওঁরাও বদরুদ্দিন আজমলের দলের সদস্য হয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করাতে ষড়যন্ত্রটা প্রকাশ পাচ্ছে।

এ ইউ ডি এফ দলের কার্যকরী সভাপতি হাফিজ রসিদ আহমেদ চৌধুরী লক্ষ্মী ওঁরাও-এর তাদের দলে যোগদান এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইচ্ছা'র কথা স্বীকার করেছেন। শ্রীচৌধুরী আরও জানিয়েছেন, লক্ষ্মী ওঁরাও তেজপুর লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। যদিও দল এখনও প্রার্থী নির্দিষ্ট করেনি বলে তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে লক্ষ্মী ওঁরাও-এর কথা হল, সংসদীয় নির্বাচনে জয়ই পারে তার হারানো 'ইজ্জৎ' পুনরুদ্ধার করে দিতে। সেক্ষেত্রে চা-বাগানের ভোট লক্ষ্মী ওঁরাওকে কেন্দ্র করে যদি এ ইউ ডি এফ-এর বাক্সে পড়ে তাহলে লক্ষ্মী ওঁরাও-কে হারানো অন্যদের পক্ষে অসম্ভব হবে।

ধুবড়িতে প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার

মনোজ ভট্টাচার্য ঃ কোচবিহার ।। মুম্বাই বিস্ফোরণে শিক্ষা নিয়ে এবার নড়েচড়ে বসল অসম পুলিশ। তবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের সতর্ক বার্তার পর অসমের চিত্রটা এখন অনেকটা অন্যরকম। অসম প্রশাসন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার বেড়া জালে মুড়ে দিতে চাইছে গোটা অসমকে।

নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলা পুলিশ জেলার সীমান্ত এলাকায় পাঁচ জঙ্গি সহ প্রচুর বিস্ফোরক আটক করেছে। জেলার মানকাচর মহকুমার টানগাঁও এবং দক্ষিণ শালমারার করকাজি গ্রামে অভিযান চালিয়েছে জেলা পুলিশ। ওই গ্রামের আচবাহার মন্ডল (৩০), সাহজুল হক (৩৫)-এর বাড়ি থেকে প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়। তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২ ডিসেম্বর অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছেন ধুবড়ি জেলা পুলিশ সুপার পার্থ সারথি মহন্ত।

এদিকে মানকাচর মহকুমার পুলিশ কর্তা গুলজার আলী জানান, মাজিবর হক (৪০), কালাম আলি (৩২), মইনুল হক (৩৩), প্রচুর বিস্ফোরক নিয়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম থেকে নদীপথে ভারত এসেছে। এই বিস্ফোরকগুলি অসম হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল।

রাষ্ট্রীয় মুসলিম মঞ্চে র গোহত্যা বন্ধে সমর্থন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এবার দেশের অন্যতম প্রধান মৌলবী ও উলেমারাও গো-হত্যাকে অন্যায় বলে মেনে নিলেন। গত ৭ নভেম্বর দিল্লীর যন্তর-মন্তরে আয়োজিত ইনসানিয়ত (মনুষ্যত্ব) অধিবেশনে আর এস এস-এর সরসঙ্ঘচালক কে এস সুদর্শনজীর উপস্থিতিতে ১২৫ জন মৌলবী বলেন, গো-হত্যা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি এক ঘোর অন্যায়।

মৌলানা জামিল আহমেদ ইলিয়াসিদের মতো উলেমারাও সুর মিলিয়ে বলেন, তাদের সম্প্রদায়ে যে, মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের কথা ভেবেই এই ধরনের আইন তৈরি করা হচ্ছে না, যেখানে মুসলমানদের গোমাংস ছাড়তে কোনও অসুবিধেই নেই। তিনি আরও বলেন, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উন্নতির জন্য গোরক্ষা অত্যাবশ্যক। একজন কৃষকের এক দু'টো গরু কাছে থাকলে আত্মহত্যার আর কোনও প্রয়োজন নেই। এই কার্যক্রমে আরও উপস্থিত ছিলেন সংঘের জাতীয় কার্যকারী কমিটির সদস্য শ্রী ইন্দ্রেশ কুমারজী, ভি এইচ পি সভাপতি শ্রী বিষ্ণুহরি ডালমিয়া, স্বামী যতীন্দ্রানন্দ এবং স্বামী রামতীর্থ মিশনের

একজনকেও যদি গো-হত্যায় জড়িত পাওয়া যায় তাকে সম্প্রদায় থেকে বরখাস্ত করা হবে, প্রয়োজনে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে।

১৯৬৬ সালের ৭ নভেম্বরে সংসদ ভবনের সামনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হওয়া গো-ভক্তদের শ্রদ্ধা জানাতে ওই সভার আয়োজন করেছিল সর্বদলীয় গোরক্ষা অভিযান এবং রাষ্ট্রীয় গো-ধন মহাসংঘ।

সুদর্শনজী গো-হত্যা বন্ধের দাবিতে একটি কঠোর আইনের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন

কাকা হরি। পাশাপাশি সভায় এসেছিলেন মুসলিম মঞ্চে র মৌলানা লুকমান, পীরজাদা সিবলি, মহম্মদ আফজল প্রমুখ। প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া গো হত্যাকারীদের ফাঁসীর দাবি করেছেন এবং কন্ধমালে স্বামী লক্ষ্মণানন্দজীর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য আওয়াজ তুলেছেন। রাষ্ট্রীয় গোধন মহাসংঘের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ এই সভায় বলেছেন, গরুকে 'রাষ্ট্রীয় প্রাণী' আখ্যা দেওয়া হোক। পাশাপাশি গো-সংবর্ধনা ও সুরক্ষার জন্য একটি বিশেষ মন্ত্রণালয় গঠনেরও পরামর্শ দিয়েছেন।

আবার দেশভাগের পদধ্বনি

কেরলে জামাত-ই-ইসলামির নতুন দল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। নিজেদের অধিকার আরও মজবুত করতে এবার জামাত-ই-ইসলামি নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের কথা ঘোষণা করল। এক দশক ধরে চলতে থাকা ভারতে স্বতন্ত্র মুসলিম সমাজ গড়ার চেষ্টাতেই এই নতুন দল গঠন। আধা রাজনৈতিক ও উগ্র ধর্মীয় এই সংগঠনের এমন ঘোষণা স্বাভাবিক ভাবেই কেরলের রাজনৈতিক মহলে সাড়া তুলে দিয়েছে। বিজেপি-র জেতাকে রুখতে তারা একসময় কংগ্রেস চালিত UPA -কে সমর্থন করেছে। যদিও আজ তারা তাদের সমর্থন কেরলে বামেদের দিকেই এগিয়ে দেবে। জামাত-ই-ইসলামির স্থানীয় নেতারা বলে দিয়েছেন তারা লোকসভা ভোটের পরেই এই দলের কাজ শুরু করবেন। খুব সম্ভবত কোচিতে একটি সভা করে তারা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

কেরলের বিরোধী দলগুলি বিভিন্ন ছক কষলেও বামফ্রন্টে খুশির হাওয়া। যারা গত বিধানসভা ভোটে তাদের তোষণ করে ভালো ফল পেয়েছে, সেই ফ্রন্ট এখন কংগ্রেস

মঞ্চে উপস্থিত জামাত-ই-ইসলামির নেতৃবৃন্দ।

চালিত মুসলিম লীগকে টেক্কা দিতে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক শক্তিশালী করতে ব্যস্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে এই ধরনের দল ছিল একমাত্র People's Democratic Party (PDP)। এই দলের নেতৃত্বে ছিল আব্দুল নাসার আল মাদানি, তিনি ১৯৯৮-এ কোয়েম্বাটোর বিস্ফোরণের ঘটনায় বেকসুর খালাস পেয়ে যান। এছাড়াও তিনি বিরোধী নেতা এল কে আদবানীকে হত্যার ছক কষেছিলেন বলে অভিযুক্ত ছিলেন। জাতীয় ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (NDF) দীর্ঘ ৯ বছর মাদানিকে কারারুদ্ধ করে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রেখেছে।

লীগ্যাল নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এবার লীগ্যাল নোটিশ জারি হল দেশের অন্যতম ইংরাজী দৈনিক বড়ন্দ্ব বনপ্পন্দ্বব্দ প্সন্দ্র ঢ়স্তন্ত্র'র সম্পাদকের উপর। এই নোটিশে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ওই দৈনিকের সাংবাদিক মাতিন হাফিজ-এর নামও রাখা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি 'Terror net widens to Gujrat VHP' (গুজরাটের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ শাখা সন্ত্রাসের জাল বিস্তার করছে) — এই শিরোনামে একটি মিথ্যা খবর ছাপেন নভেম্বরের ৯ তারিখে ওই দৈনিকের ফ্রন্ট পেজে। এই লেখার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছে ইন্দ্রপ্রস্থ-র বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (VHP)। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সত্যেন্দ্র মোহনের পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট এস এস শামসেরি লীগ্যাল নোটিশটি জারি করেন। নোটিশে বিশেষভাবে বলা হয়েছে নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ওই সংবাদপত্রকেই-এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। অন্যথায় আইনানুসারে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খোদ দিল্লীর বুকে নকল পাসপোর্টের রমরমা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দিল্লীর বুকে ক্রমশই জাল পাসপোর্টের কারবার রমরমিয়ে বাড়ছে। খোদ রাজধানী শহরেও একশ্রেণীর পেশাদার দুস্কৃতী প্রশাসনের নাকের ডগায় এই জাল পাসপোর্ট তৈরির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা শুধু জাল পাসপোর্ট নয়, অনেক ক্ষেত্রে আসল পাসপোর্ট থেকে ভিসা করিয়ে দেওয়ার নাম করেও মোটা টাকার ব্যবসা চালাচ্ছে। গত সপ্তাহেই এই ঘটনায় দিল্লী পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই চার যুবক অবাধে জাল পাসপোর্টের ব্যবসা করত। তাদের একটি গোপন অফিসঘরও ছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। দিল্লী পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (স্পেশাল সেল) অলোক কুমার জানিয়েছেন, ওই চার দুস্কৃতী দিল্লীর এক কলোনীতে বসবাস করত। তারা হরিশ ইন্দানি নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ভিসা করিয়ে দেওয়ার নাম করে বেশ কিছু টাকা আত্মসাৎ করে। হরিশ ইন্দানি লিখিত অভিযোগ জানালে পুলিশ তদন্তে নামে এবং ওই চারজন দুস্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ওই চার দুস্কৃতীদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীগোষ্ঠীর কোনও যোগসাজস আছে কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে।

তবে দিল্লীর বুকে নকল ভিসা ও পাসপোর্টের ব্যবসা ধরা পড়া এই নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরেই একশ্রেণীর দুস্কৃতী এই কাজে যুক্ত। তারা বিভিন্ন বেসরকারি ভ্রমণ ও পর্যটন কেন্দ্রের কর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। দিল্লী পুলিশ বহুবার এই ঘটনার প্রমাণ পেয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির তেমন কিছু উন্নতি হয়নি।

তবে বর্তমানে দেশজুড়ে সন্ত্রাসবাদী তান্ডবলীলার মাঝে পুলিশ আরও সজাগ না থাকলে নকল পাসপোর্ট ও ভিসার ব্যবসাকে সন্ত্রাসবাদীরাও কাজে লাগাতে পারে বলে সুরক্ষা দপ্তরের একাংশের ধারণা।

হিন্দিভাষী ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আবেদন মোদীর

প্রাণপ্রতিম পাল ।। হিন্দিভাষী ব্যবসায়ীদের বিহারে পুনরায় বিনিয়োগের আবেদন জানালেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী। গত ২৩ নভেম্বর বিকেলে শিলিগুড়ির খালপাড়ার ডালমিয়া ভবনে গিয়ে হিন্দীভাষী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রাক্তন বিদ্যার্থী পরিষদ কর্মী শ্রীমোদী।

এদিন শিলিগুড়িতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ আয়োজিত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ নিয়ে এক সেমিনারে যোগ দিতে আসেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী। শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি ভগবতী প্রসাদ ডালমিয়ার বাড়িতেও যান। সেখানে তিনি বলেন, 'আপনাদের পরিচিত সেই বিহার আজ আর নেই। বিহার পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। আপনারা বিহারে ফিরে পুঁজি বিনিয়োগ করুন। বিহার প্রশাসন আপনাদের সব ধরনের গ্যারান্টি দেবে।' এইসব ব্যবসায়ীদের বিহারে পৈত্রিক বাড়ি ছিল। নানা কারণে তারা বিহার থেকে ব্যবসা গুটিয়ে

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সুশীল কুমার মোদী (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়)।

শিলিগুড়িতে বিনিয়োগ করছেন। বিহারে কারখানা চালাতে বা ব্যবসা করতে এইসব ব্যবসায়ীদের কী রকম অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়, শ্রীমোদী বৈঠকে তাও জানতে চান।

তিনি বলেন, বিহারে আমরা সব ধরনের বিনিয়োগকে স্বাগত জানাই। বিহারে পুনরায় বিনিয়োগ করলে শিল্পোদ্যোগীদের বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

অবাক হওয়ার কী আছে? সরকার তো সবই জানতো

অরুণ শৌরী

আমাদের উপকূলবর্তী অঞ্চল এখন সন্ত্রাসবাদীদের কবলে এবং এরা নিরন্তর এই পথে ভারতে প্রবেশ করছে এবং এই পথেই দেশে অস্ত্র আনছে — এমনই বলেছিলেন সদ্য প্রাক্তন হওয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ২০০৬-এর নভেম্বরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ কর্তাদের সম্মেলনে। আমরা জানি, সন্ত্রাসবাদীরা এই উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত বিভিন্ন তৈল শোধনাগারের তথ্য পাঠাচ্ছে। লস্কর-এ-তৈবা-র কিছু জঙ্গিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এইসব শোধনাগারগুলিতে অন্তর্ঘাত চালানোর জন্য। এদের কর্মসূচীতে এমনও পরিকল্পনা রয়েছে যে, উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির যেসব জায়গায় জনবসতি নেই সেইসব অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়ে অপারেশন

বোমা বিস্ফোররেণ পর ট্যাক্সির অংশবিশেষ।

চালানোর।

এমনই সব সতর্কবাণী আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে। আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রীও কম যান কিসে? ২০০৭-র ৯ মার্চ সংসদে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আমাদের গোয়েন্দারা তো সবসময়ে বলে আসছে যে, জঙ্গিরা সমুদ্রপথ ব্যবহার করে তৈল শোধনাগার-গুলিতে আঘাত হানতে পারে — একথা কি সত্যি? প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর স্পষ্ট উত্তর — হ্যাঁ। এমন সব গোয়েন্দা রিপোর্ট আমাদের কাছে আছে। তাঁকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, জল সীমার মধ্যে যে মাদক দ্রব্যের চোরাচালান, জলদস্যুদের হামলা এবং আরও বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্ম চলছে তা কি সরকার অবহিত?" তাঁর উত্তর, "হ্যাঁ"।

২০০৭-র ৯ মার্চ একই প্রশ্ন করা হয়েছিল রাজ্যসভায় শিবরাজ পাতিলকে। তাঁর উত্তর ছিল — "প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জঙ্গিরা বিশেষতঃ লস্কর-এ-তৈবা জলপথেই তাদের লোকজন এবং অস্ত্রশস্ত্র ঢোকাবার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে।"

ডিসেম্বর ৮,২০০৭। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন চতুর্থ আঞ্চলিক নিরাপত্তা শীর্ষ সম্মেলনে এক ভাষণে বিশ্বকে জানাতে চেয়েছেন — "গোয়েন্দাসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী পাক-আফগান সীমানায় ১৪-১৫টি দেশ থেকে আসা জঙ্গিরা সন্ত্রাসবাদের তালিম নিচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ অনেক কঠিন এবং অনেক বেশী ভয়াবহ। এই প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের বোঝানো হয় কোন্ কোন্ স্থানগুলি লক্ষ্যবস্তু, আঘাত হানার লক্ষ্য স্থলগুলির সংবেদনশীলতা, এইসব স্থানে জঙ্গিদের যোগাযোগ কতটা সহজসাধ্য, কোথায় কোথায় বাধা কম ইত্যাদি। সমুদ্র পথই হল অনেক সহজগম্য, এমনকী স্থলে আঘাত হানার ক্ষেত্রেও। এইসব একেবারে অধুনা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকাতে দেখা গেছে।" "সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারতের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে আমি সতর্ক করে সবাইকে জানাতে চাই যে আমাদের আত্মতুষ্টির কোনও অবকাশ নেই"।

মার্চ ১১, ২০০৮ স্থান দিল্লী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি এবার বক্তা। বক্তব্য রাখলেন, International Maritime Search and Rescue Conference-এ । উপস্থিত সমবেত অংশগ্রহণকারীদের সতর্ক করে সমুদ্র পথে আক্রমণের কথা বললেন। এই বক্তব্যের মধ্যে তিনি স্বীকার করে নিলেন যে, উপকূল-রক্ষীদের সংখ্যা কম এবং তাদের লড়াইয়ের সরঞ্জামও অপ্রতুল। আশ্বস্ত করলেন পরিকাঠামোকে উন্নত করে উপকূলরক্ষী বাহিনীকে উন্নত করা হবে। মুম্বাইতে বিস্ফোরণের মাত্র একপক্ষকাল আগে ১৩ নভেম্বর ২০০৮-এ মনমোহন সিংহ BIMSTEC সম্মেলনে সতর্ক করে বলেছিলেন, "সন্ত্রাস এবং সমুদ্রপথের বিপদ আমাদের রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে।"

এবার ভাষণের পালা শিবরাজ পাটিলের। মুম্বাই আক্রমণের মাত্র ৪দিন আগে শিবরাজ রাজ্যগুলির পুলিশ অধিকর্তাদের সামনে বললেন, "সন্ত্রাস রুখতে আমাদের সজাগ থাকতে হবে, যেন অন্যদেশ থেকে জঙ্গিরা যাতে এদেশে ঢুকতে না পারে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে জঙ্গিরা যেন জলপথ অথবা সীমানা পেরিয়ে আমাদের পড়শী দেশগুলি থেকে এদেশে আসতে না পারে। দেশের উপকূল অঞ্চলে নৌ-সেনা, উপকূল পুলিশ ফোর্সের সতর্কতা বাড়াতে হবে, টহলদারি বৃদ্ধি করতে হবে। রাজ্যের স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সি আই ডি-র লোকজনদের নজরদারি রাখতে হবে সেইসব লোকদের ওপর যারা স্লিপার সেলের অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করছে বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছে।"

পরিতাপের বিষয় হল, এমন সাবধান বাণী উচ্চারণের মাত্র ৪দিনের মধ্যেই সেই জলপথ ব্যবহার করে মুম্বাইয়ে হামলা চালালো জঙ্গিরা। তবে কি শিবরাজ পাতিলরা সরকারের উপদেষ্টা নাকি সরকারি কর্ত্তা? এঁদের কাজ কি শুধু সতর্কবাণী উচ্চারণ করা নাকি সেই সতর্কতা অনুসারে যাতে কাজ হয় তার ব্যবস্থা করা? কিন্তু কর্তাদের সতর্কতার হাল এরকম। ১৯৯৩ সালে মুম্বাই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল এই জলপথকেই ব্যবহার করে। সেই বিস্ফোরণ কি কড়া সতর্কতা অবলম্বনের পক্ষে যথেষ্ট নয়?

এর সাত বছর পর ২০০০ সালে এই সতর্কতা ও ১৯৯৩ সালের শিক্ষাকে কার্যে রূপায়িত করা হল। বর্ডার টাস্ক ফোর্স গড়া হল কার্গিল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সতর্ক করে বলল, দেশের দীর্ঘ সমুদ্রউপকূলের অনেকটাই অরক্ষিত। উপকূলের এইসব নির্জন এলাকায় অস্ত্রের চোরাচালান এসে জড়ো হচ্ছে"। এই টাস্ক ফোর্স স্মরণ করিয়ে দিল কীভাবে মুম্বাই বিস্ফোরণের (১৯৯৩) অস্ত্র-শস্ত্র মুম্বাইয়ে আনা হয়েছিল। অবস্থা পরিবর্তনে কীভাবে আই এস আই তাদের জাল উপকূল অঞ্চলে

সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে হোটেলে।

বিস্তার করে একেবারে কেরল পর্যন্ত বিস্তার করেছিল তার রূপরেখা আগাম জানিয়েছিল এই টাস্ক ফোর্স। তারা বলেছিল এই বিস্তৃত অঞ্চলকে অরক্ষিত রাখা যাবে না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। টাস্ক ফোর্স সরকারকে বলেছিল যে, লাক্ষাদ্বীপের ছোট ছোট দ্বীপগুলিকে আই এস আই ব্যবহার করছে অস্ত্র রপ্তানির ক্ষেত্র হিসেবে এবং লোকও পাঠাচ্ছে ওইসব এলাকায়। এই সংস্থা দাউদ ইব্রাহিম ও তার সাগরেদদের এই রুট ব্যবহার করে অস্ত্র আমদানি করতে সাহায্য করেছে। ডন দাউদ এবং তার নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদের কাজে লিপ্ত আই এস আই।

বর্তমানে লাক্ষাদ্বীপে ৩৬টি দ্বীপ রয়েছে। এর মধ্যে আবার ১০টা জনমানব শূন্য। সুহেলি দ্বীপ সম্বন্ধে এই টাস্ক ফোর্স বলেছে যে, নির্জন এই দ্বীপের সমুদ্রে স্মাগলারদের জাহাজ ছাড়াও রোটর হেলিকপ্টার (যা মিলিটারীতে ব্যবহৃত হয়) অবতরণ করতে দেখা গেছে এবং এই দ্বীপের চারধারে অজানা হেলিকপ্টার আনাগোনা করতেও দেখা যাচ্ছে। আর আমরা কি করছি? এই টাস্ক ফোর্সের গোয়েন্দারা খবর সংগ্রহ করে বলেছে, এই ৩৬ টি দ্বীপের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মাত্র ১ জন ইনস্‌পেক্টর, ১ জন সাব ইনস্‌পেক্টর, ১ জন হেড কনসটেবল এবং ৩ জন কনসটেবল। এঁরা কাজ করছেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের অধীনে এবং তাঁদের প্রধান কার্যালয় কাভারত্তি।

আমি গোয়েন্দা দপ্তরের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর কাছে প্রশ্ন করেছি, আজকের সুরক্ষার পরিস্থিতির সঙ্গে পূর্বের পরিস্থিতির তফাৎ কতটুকু? তাঁর সোজাসাপটা উত্তর — সেদিনকার সঙ্গে আজকের তফাৎটা হচ্ছে শুধু কাভারত্তির অফিসার-ইন-চার্জের পদমর্যাদা বেড়েছে। তিনি এখন অ্যাসিসটেন্ট ডাইরেক্টর বা ডেপুটি সেন্ট্রাল ইনটিলিজেন্স অফিসার। পদমর্যাদা বাড়লেও তাঁকে সেই একই কাজ করতে হচ্ছে এবং আমরা অবাক হচ্ছি। এবং আমি এমন বহু উদাহরণ দিতে পারি। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ আমার মনে পড়ছে। তা হল — রাজ্যসভায় এক বিতর্কের সময় আমি টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে যখন বলতে শুরু করেছি, তখনই হৈ চৈ বাধিয়ে কংগ্রেসীরা বলে উঠলেন, "এ তো গোপন রিপোর্ট। ... আপনি এটা পেলেন কী করে?... আপনি এটা পড়ছেন কীভাবে?" আমাকে প্রায় ধমকের সুরে দমিয়ে দিলেন শিবরাজ।

কি কি কাজ করতে হবে? প্রথমে তো টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ কার্যকর করা, দ্বিতীয়ত এটা ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সংসদে পাশ করিয়ে সরকারের কাছে পাঠানো যায়। আমরা যখন নেতা নির্বাচন করি সেই নেতারা পুলিশকে কার্যত প্রাইভেট আর্মি বানিয়ে ফেলে, এবং তাদের অধীনস্থ তদন্তকারী সংস্থার কাজ হল বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ করা আর মিত্রদের রেয়াত করা। তৃতীয়ত মনে রাখবেন, কাজের কাজ কিছুই হবে না যদি না সমস্ত সরকারি দপ্তর একইসঙ্গে কাজ করে। আমাদের ভাল কমাণ্ডো ফোর্স রয়েছে, কিন্তু বিচার ব্যবস্থা ঢিলেঢালা—এমনটা হতে পারে না। সেনা গোয়েন্দারা যেমন জঙ্গিদের ধরবে আর আমাদের আদালতগুলি তাদের ছেড়ে দেবে, এটা যেমন সম্ভব নয় আবার ধৃত জঙ্গিরা জেলে বসে আরাম করে সরকারি অতিথিরূপে বছরের পর বছর কাটাবে, এমন ব্যবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। যখন কে পি এস গিল পাঞ্জাবকে সন্ত্রাসমুক্ত করলেন তখন লোকাল থানাস্তর পর্যন্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থত, এক দুর্বল এবং হতবাক সমাজের দায়িত্ব এমন লোকজনের হাতে ন্যস্ত তারা জাতীয়তাবাদ শব্দটাকে এক

বিস্ফোরণ ঘটেছে তাজ হোটেলের চূড়ায়।

নোংরা শব্দে রূপান্তরিত করেছে। এইসব লোকজন হল আমাদের মিডিয়া আর রাজনৈতিক নেতারা। ষাট-সত্তর হাজার নিরপরাধ মানুষ জঙ্গিদের শিকার আর আমাদের নেতারা ফেডারেল তদন্ত এজেন্সী তৈরি করবে কিনা তা নিয়ে ভাবছে। ষাট-সত্তর হাজার মানুষ জঙ্গিদের হাতে বেঘোরে মারা গেল। আর আমাদের নেতারা বিতর্কে মশগুল জঙ্গি দমনে আরও কঠিন আইন বানানো যায় কিনা!

অবশ্যই আমাদের কড়া আইন দরকার, আমাদের ফেডারেল এজেন্সীর দরকার। কিন্তু শুধু আইন থাকলে কি হবে? অবশ্যই আমাদের তা প্রয়োগ করতে হবে। মজার ব্যাপার হল, একদিকে গুজরাট বিধানসভায় পাশ হওয়া আইন সরকার যেমন মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কের চিন্তায় তা প্রয়োগে সম্মতি দিচ্ছে না, অথচ একই আইন প্রতিবেশী রাজ্য মহারাষ্ট্রে তা চালু রয়েছে। কিন্তু আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও দুঃখের বিষয় মহারাষ্ট্র সরকার

(এরপর ৯ পাতায়)

সন্ত্রাসই সন্ত্রাসবাদীদের জবাব

চন্দন মিত্র

সত্যিই সন্ত্রাস আজ ভারতকে কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। অঙ্কুরেই বিনাশ করার যে সুযোগ এসেছে, ভারতীয় ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির চাপে বারবার তার অপব্যবহার হয়েছে। মুম্বাই-এ নৃশংস হত্যালীলার পর আজ যদি ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে দেওয়া না হয়, তাহলে আর বোধ হয় কোনওদিনই হবে না। ভারতবর্ষ এখন অন্ধকারে নিমজ্জিত। ১০০ কোটির অধিক মানুষের এই আজ অসহায়, হতাশ ও ক্রুদ্ধ। অক্ষমতা এখন এদেশের ছায়াসঙ্গী। আমরা কেন সন্ত্রাসবাদীদের এই মৃত্যুনাচন বন্ধ করতে পারছি না? সন্ত্রাসবাদীদের উন্মত্ত রক্ত পিপাসার কাছে কত নির্দোষ ও সাহসী সৈনিকদের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই! কীভাবেই বা ৯/১১-র বিস্ফোরণের পর আমেরিকাতে দীর্ঘ সাত বছরে আর কোনও জঙ্গি আক্রমণ হলনা?

এমনকী প্রায় শিথিল দেশদুটিতে (বৃটেন ও স্পেন) ২০০৭-এ লন্ডনে বিস্ফোরণ ও মাদ্রিদের ট্রেনে বোম্বিং-এর পর আর কোনও জঙ্গি হামলা কার্যত হয়নি। আরও ভাবলে দেখা যাবে, ইজরায়েল-এ, যা নাকি জেহাদীদের টার্গেট লিস্টে একনম্বরে, গত ত্রিশ মাসে মুম্বাই হামলার মতো এত বড় ধরনের কোনও আক্রমণ হয়নি। অন্যদিকে পাকিস্তানের কথা বলতে গেলে, তারা এমনিতেই বিশ্বের কাছে দুর্বল হিসেবে চিহ্নিত, যদিও কৌশল বা চাতুরিতে সে দেশ শীর্ষে। অন্যদিকে একটু বিবেচনা করলেই দেখা যাবে, আমরাও কী আমাদের ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে দুর্বল হিসেবে প্রতিপন্ন করছি না? ২৭। ১১-র রাতের মুম্বাইয়ের তাজ হোটেলে তখনও কমান্ডোদের অপারেশন চলছিল, ছবিটা ছিল ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন। সমস্ত ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াগুলিতে যেন মুম্বাইয়ের একটা 'শো' চলছিল; তবে এই মিডিয়াগুলি সবার অগোচরে সন্ত্রাসবাদের ধ্বংসলীলাকে — সে ১৯৯৩ এর ঘটনাই হোক বা ২০০৯-এর ট্রেন ব্লাস্ট — খোঁচা দিয়ে গিয়েছে। যাইহোক, মুম্বাইবাসীরা এখন তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, ঘৃণা খোলাখুলি উগরে দিচ্ছেন। তাদের বক্তব্য, একের পর এক তাদের জীবন ও সম্মানের ওপর এরকম আঘাত শুধু তাদেরই নয়, মুম্বাই শহরেরও ঘোর অপমান। কিছু শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের পোষণ করা ছবিটা মুম্বাইবাসীদের শুধু ঐশ্বর্য, বৈভব, গ্ল্যামার নিয়ে চলার অভ্যাসটাকে একেবারে গতানুগতিক করে তুলছে। তারা একেবারেই ভুলে গেছে মুম্বাইয়ের একটা প্রাণ আছে এবং তার শরীর থেকে আজ ব্যাপক রক্ত ঝরছে।

যখন আমরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাসে পরিস্থিতি দেখতে

মুম্বাইয়ের সন্ত্রাসবাদীদের একজন।

গেলাম যাটজনের বেশি নিরীহ গুলিবিদ্ধ যাত্রীদের আত্মীয়রা তখন নিজেদের হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের কিছু স্মৃতি যদি রক্ষা করতে পারে তার চেষ্টা করছিল। তারা যন্ত্রণা ভরা গলায় চিৎকার করে বলছিল — এই যন্ত্রণার কবে শেষ হবে? কবে আমরা নিরাপত্তার আশ্বাসটুকু অন্তত ফিরে পাবো? যদিও তাদের কথাগুলো টিড্রেন্ট ওবেরয়, তাজ প্যালেস হোটেল, ভ্রাম্যমান ইহুদীদের ডেরা নারিম্যান হাউসের নাটকীয় আক্রমণের থেকে অনেকটাই কম আঘাত করে। কিন্তু দুঃখ, ভীতি ও জীবনহানির গল্পে সব হামলারই একটা সাধারণ ক্ষয়সাধনের প্রবণতা খুব প্রকট। আমরা জেজে হাসপাতালে দূরে এককোণে একটা বেডে পড়ে থাকা নিভৃত সাবন্ত নামে এক কনস্টেবলের সঙ্গে দেখা করি, সে হাসি মুখে তার আক্রান্ত হওয়ার গল্পগুলো আমাদের শোনাচ্ছিল। সে দেখাচ্ছিল কীভাবে গুলিতে তার বেল্টটা ফুটো হয়ে গেছে,পরপর তিনটে গুলি লেগেছে তার মধ্যে একটা গুলি সোজা গিয়ে তার স্টমাকে বিঁধেছে।

তারপর আমরা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সদানন্দ দাতের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি তার চোখে গ্রেনেডের আঘাত নিয়ে চিকিৎসারত ছিলেন, তিনিও সমান জোরের সাথে ঘটনার বয়ান তুলে ধরলেন। তিনি নাকি ট্রবত্র প্রধান হেমন্ত কারকরের হত্যার প্রতক্ষ্যদর্শী ছিলেন। আমরা যখন তার ছুটির সময়টুকু জানতে চাইলাম, তিনি হাসিমুখে বললেন, স্যার চিন্তা করবেন না, আমরা ওদের ধরবই, ওদের প্রত্যেককে ধরব। ওরা সত্যিই সাহসী এবং শৌর্যের অধিকারী, যারা সবসময় জীবন নিয়ে খেলা করে আমাদের জীবনকে স্বাভাবিক করে রাখার চেষ্টা করছে। কারকরে, কামতে, সালাসকার, উন্নিকৃষ্ণন - রা এবং এদের সহযোগীরা ধবংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়ছে। কিন্তু আমরা কি কখনও তাদের বিদেশী ও দেশে বেড়ে ওঠা জঙ্গিদের সাথে মোকাবিলা করার মতো সমমানের শক্তিশালী করে প্রস্তুত করতে পেরেছি, সেই ঢাল-তলোয়ার দিতে পেরেছি!

মাছ ধরার ট্রলারগুলোতে তল্লাশি কি চালানো হয়েছিল? জঙ্গিরা যে নৌকাগুলোতে করে আসতে পেরেছিল সেগুলোকে কি পথে থামিয়ে চেক্ করা হয়েছিল? কোনও উত্তর নেই! যদি হত! যদি পাঁচতারা হোটেলের ভিতর থাকা সর্ষের ভেতর ভূতগুলোকে, যাঁরা ওই জেহাদীদের সাহায্য করেছে, আগেই আগাছার মতো নির্মূল করা যেত তাহলে হয়তো এতগুলো প্রাণ নাও শেষ হতে পারত। পুলিশ, এন এস জি, সেনা সবাই মিলে জঙ্গীদের নিঃশেষ করে তেরঙ্গা উড়িয়ে দিল। কিন্তু ওই সন্ত্রাসকে কখনই শুধু বন্দুক দিয়ে দমন করা সম্ভব নয়, বুদ্ধি ও কৌশল সমানভাবে জরুরী। কৌশলগুলো যথাক্রমে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, কঠোর আইন প্রণয়ন এবং সেইসঙ্গে অবশ্যই দ্বন্দ্বত্বন্দ্ব বুলেট প্রুফ থাকতে হবে। স্ফীত সুরক্ষাবলয় এবং অগ্নিপ্রাচীর নির্মাণ করতে হবে আমাদের সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করার জন্য। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আমাদের একটা মানসিক পরিস্থিতি হল চোখ বুঁজে সব সহ্য করে যাওয়া। এই সহনশীলতার ঘেঁতো চামড়াটাকে এবার ছুঁড়ে ফেলার সময় এসেছে। বছরের পর বছর ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি, মুসলিম তোষণের ফলে আমাদের দেশ দুর্বল ও জঙ্গি কার্যকলাপের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। এই প্রথার জগদ্দল পাথরকে না ওপরে ফেললে অবশ্য আমরা জঙ্গী দমনের সেই শক্তি কখনই করায়ত্ত করতে পারব না। হ্যাঁ আজকে সময় এসেছে ভয় দেখানোর — সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শুভ শক্তির সন্ত্রাস জারী করার। আল-কায়েদা অথবা ঘরের মাটিতে বেড়ে ওঠা অন্য যেকোনও জঙ্গি সংগঠনই হোক তারা যেন এ দেশকে ভয় পেতে শুরু করে। তাদের জেনে রাখা দরকার যে, তারা যে শতসহস্র অসহায় মানুষকে খতম করছে, ভারতও পারে তার জবাব দিতে, তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

এককথায়, সন্ত্রাসবাদীদের সন্ত্রস্ত করে তুলতে হবে। এবং তার চাবিকাঠি হল তাদের ভয় দেখানো, তা যত নৃশংস উপায়েই হোক! সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের ধবংস লীলায় সাহায্যকারীদের জনসমক্ষে নিয়ে এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেই হবে। ভারতকে এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে সন্ত্রাস নিয়ে যারা খেলা করে তারা যেন এদেশে পা ফেলতে পর্যন্ত ভয় পায়, ধবংসলীলা তো দূরের কথা। আমরা কোনওমতেই তাদের মুম্বাই, দিল্লী, হায়দরাবাদ, জয়পুর, আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর এবং অন্য শহরগুলোতে এইভাবে একের পর এক আক্রমণ করতে দিতে পারি না।

দেশের মানুষ আজ সমস্ত দমন পদ্ধতিকে সমর্থন করবে, শুধু যখন আক্রমণ তখনই দমন নয়, প্রয়োজনে যুদ্ধ চাই। যদি শয়তানদের পুরোপুরি শেষ করার জন্য ভালো কিছুকে চোখ বুজে ভুলে যেতে হয়, তাও সই। আমাদের শুধু একটাই জন্মভূমি, ভারতভূমি। আর মাতৃভূমির সম্মান রক্ষা করতে প্রত্যেক সত্যিকারের ভারতবাসীকে ওই অশুভ যোদ্ধাদের শেষ করে নিজেদের প্রতিপত্তি দেখাতে হবেই হবে!

মুম্বাইয়ের ছত্রপতি শিবাজী স্টেশনে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের পর বিধ্বস্ত চেহারা।

সরকার তো সবই জানতো

(৮ পাতার পর)

তা প্রয়োগ করছে না। জঙ্গিরা স্থানীয় সাহায্য ছাড়া কীভাবে জানবে ইহুদী, ইজারায়লীরা কোন্ হোটেলে আছে। আপনারা ভাবুন, এই জঙ্গি হানার পিছনে কয়েক মাসের প্রস্তুতি দরকার। স্থানীয় সাহায্য ছাড়া এত অস্ত্র, হোটেলের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য, কোথায় অস্ত্র নামানো হবে ইত্যাদি জানা কখনই সম্ভব নয়। এবং আইন প্রয়োগের অর্থ হল আদালত আইন অনুসারে যা শাস্তি ব্যবস্থা করবে তা রূপায়ণ করা। সংসদ ভবন আক্রান্ত হল, রক্ষীরা প্রাণ দিলেন, ধৃত জঙ্গিদের সাজা ঘোষণা হল এবং তা উচ্চতম আদালত অনুমোদন করল। ইতিমধ্যে ৮ বছর অতিক্রান্ত, অথচ তার কাগজপত্র নাকি এখনও তৈরি হয়নি''। এর জন্য স্বাক্ষর অভিযানও হল। এমত অবস্থায় সন্ত্রাসবাদীরা তার লক্ষ্য সিদ্ধ করবে, ধরা পড়বে এবং তার সাহায্যে এগিয়ে আসবেন কোনও নামকরা উকিল। বিচারকরা তার প্রতি সদয় হবেন এবং অবশ্যই তার সমর্থনে এগিয়ে আসবে মানবাধিকার কমিশনের কোনও কেউকেটা।

এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে সমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে আমরা লড়ছি জঙ্গিদের সঙ্গে। এই যুদ্ধে আমাদের জিততে হলে আমাদের আক্রমণ করতে হবে। কে পি এস গিল যথার্থই বলেন যে, জঙ্গি দমনে পাল্টা আঘাত হানো, খতম করো, একটা চোখের বদলে দুটো চোখ উপড়ে ফেলো। কেউ যদি তোমায় একটা দাঁত ভাঙ্গে, তার পুরো চোয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। মানবাধিকার? হ্যাঁ, জঙ্গিদের মানবাধিকার আমরা সম্মান দেব যদি জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা, তাদের স্থানীয় মদতদাতারা আমাদের নাগরিকদের মানবাধিকারকে সম্মান জানায়।

অবশেষে আমাদের বুঝতে হবে পাকিস্তানের সামাজিক অবস্থাটা কী। যদি আমরা সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে বুঝতে না পারি যে, পাকিস্তানে পরিবর্তন আসছে ততক্ষণ সেই দেশের নেতাদের মিথ্যা স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করাটা মুর্খামি ছাড়া কিছুই নয়। মনে করুন, মুশারফের সেই ন্যাকামো উক্তি—''আমি নতুন মন নিয়ে এসেছি?'' তালিবান, আল কায়েদারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ফসল নয়, বরং পাকসমাজ ও রাষ্ট্র তালিবানাইজেশনের পরিণাম।

আপনারা চিন্তা করুন, প্রথম শ্রেণী থেকে শিশুদের মনে জেহাদ গেঁথে দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, জেহাদের জন্য বলিদানের কথা। বলা হচ্ছে জেহাদের মাধ্যমেই বাঁচো, মরো। জেহাদকে ভালবাসো তবে জেহাদের আশীর্বাদ লাভ করবে। আপনার কি মনে করেন এইসব নির্দেশ মৌলবাদীদের, যারা তাদের নির্দেশ স্কুলগুলিতে পাঠাচ্ছে? মোটেই তা নয়। পাকিস্তানী সরকার তাদের সার্কুলারের মাধ্যমে স্কুলগুলিতে এই নির্দেশ পাঠাচ্ছে। আমরা এই সমস্যার সমাধানের শিবরাজ পাটিলের ওপর ভরসা রাখতে পারি না, অথচ আমরা এমন একটি লোকের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছি। এর দায় কার — শিবরাজের না খোদ প্রধামন্ত্রী মনমোহনের?

ধর্মের কল

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কিনা জানি না, তবে কর্মের ফলে যে জীবদ্দশায় অনেককেই ভুগতে হয় তার রয়েছে ভুরি ভুরি উদাহরণ। সিঙ্গুরের তাপসী মালিক হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত সিপিএম নেতা সুহৃদ দত্ত ও পার্টি কর্মী দেবু মালিকের ক্ষেত্রেও আজ একথা প্রযোজ্য। কারণ তাঁরা আজ কর্মদোষে আদালতের নির্দেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। তাঁদের ঠাঁই এখন জেলে।

সুহৃদকে নিয়ে সিপিএম নেতৃত্বের গর্বের সীমা ছিল না। তাঁকে নির্লোভ, কর্তব্যপরায়ণ, পরোপোকারী, চরিত্রবান — এমনকী সংসারের প্রতি নিরাসক্ত সন্ন্যাসী বলেও সার্টিফিকেট দেন তাঁরা। হ্যাঁ, সন্ন্যাসীই বটে! অনেকের ধারণা, তাপসী খুনের ষড়যন্ত্রের কথা সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বও জানতেন। আর এ ধারণা যদি সত্যি হয় তবে সুহৃদ-দেবুই শুধু অপরাধী নন, অপরাধী তাঁরাও। কিন্তু তাঁদের বিচার করবে কে? তাঁরাই যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁদের শাসনে যে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে!

সিপিএম নেতৃত্ব প্রথম থেকেই তাপসী হত্যা মামলায় সি বি আইয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ জানিয়ে আসছেন। তাঁরা সম্ভবত এই মামলার পরিণতির কথা আগাম বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মুখ রক্ষার জন্য তাঁরা ষড়যন্ত্রের বুলি আওড়ে যাচ্ছেন। তাঁরা সর্বত্র তাই বলে বেড়াচ্ছেন — সুহৃদ-দেবু নির্দোষ। ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, রাজ্য সরকারই যেখানে মামলার তদন্তের ভার সি বি আইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে এবং আদালত সেই তদন্তের নথিপত্র খতিয়ে দেখে রায় প্রদান করেছে, সেখানে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ধোপে টেঁকে কি? আদালতের রায় তাঁদের পছন্দ না হতেই পারে, তাই বলে তাঁকে অস্বীকার করার কোনও অধিকার তাঁদের আছে কি? কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। আদালতের রায় নিজেদের পক্ষে গেলে মানবো, আর বিরুদ্ধে গেলে বলবো — ষড়যন্ত্র! এটা কেবল মার্ক্সবাদীদের পক্ষেই মানায়। যাঁদের নীতিই হল, আইনকে বুড়ো আঙুল প্রদর্শন, তাঁদের কাছ থেকে আর অন্য কী আশা করা যায়?

ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও এবং গুজরাটের মোদাসার জোড়া বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডা হিসাবে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। তাঁরা হলেন শ্যামলাল সাহু, অবসর প্রাপ্ত মেজর রমেশ উপাধ্যায়, সমীর কুলকার্ণী ও সাধবী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। তারা নাকি বি জে পি ও সংঘ পরিবারের লোক। আদবানীজী অবশ্য এই ঘটনার পূর্বেই এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। ব্যাপারটা বিচারাধীন হওয়ায় সিদ্ধান্তমূলক কোনও মন্তব্য করা এখনই সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ যে কংগ্রেস এই সূত্রে এক মওকা পেয়ে বিজেপিকে "সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর" বলে অপপ্রচার শুরু করেছে। কংগ্রেসের এই উল্লাসে মনে হল "চোরের মায়ের বড় গলা" প্রবাদটা মিথ্যা নয়। অভিযোগটা আক্ষরিক অর্থেই ভিত্তিহীন, কারণ উপরিউক্ত দুর্ঘটনার সঙ্গে বিজেপি বা প্রায় আট দশকের প্রাচীন সংঘ পরিবারের ঘোষিত আদর্শ ও কাজকর্মের সঙ্গে কোনও মিলই নেই। থাকলে তারা অনুরূপ ঘটনা দিয়েই যাত্রা শুরু করতে পারত। স্বাধীনতার গত ছয় দশকে প্রথমাবধি গান্ধীজীর আদর্শে ও নেহরুর নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার সংখ্যাগুরু হিন্দুজাতির প্রতি একটানা বৈরীতার দ্বারা তাদেরকে কোণঠাসা করে দিয়েছে, যার বিস্ফোরক প্রতিবাদও স্বাভাবিক। বিজেপি ও সংঘ পরিবারের সংগ্রাম দেশ জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে। অতএব, বিজেপির ভাবমূর্তি নষ্ট করার মতো মূর্খতা তার কোনও সদস্যের পক্ষে সম্ভব কি? ভারতের বৈদিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতির পরিচয়টা মুছে দিতে শাসকগোষ্ঠী সর্বাত্মক যুদ্ধে নেমেছে।

সঙ্ঘ পরিবার কংগ্রেসের চাতুর্যের শিকার। আজ ভারতকে সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যে পরিণত করেছে কংগ্রেসই, ভোট ব্যাঙ্কের লক্ষ্যে মুসলিম তোষণ ও বেআইনি অনুপ্রবেশে তোল্লা দিয়ে। সেই বিচারে কংগ্রেসই সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর ও ধাইমা একই সঙ্গে।

অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকেশ্বর, হুগলি

পুলিশ পার্টির পেয়াদা

"স্বস্তিকা" পত্রিকায় (১০ নভেম্বর, ২০০৮) প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই আমার বক্তব্য। গত ৩২ বছরে বামজমানায় পুলিশ সি পি এমের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছে। একদম স্থানীয় স্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত পুলিশকর্তাদের অধিকাংশই সি পি এম নেতাদের কথাতেই ওঠা-বসা করেন। বুদ্ধ দেববাবুর নিজের "শান্তির মরুদ্যানেই' এরূপ ঘটনায় আমরা রাজ্যবাসী বিস্মিত। ২ নভেম্বর শালবনীতে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানার শিলান্যাস করে ফেরার পথে যে মাইন বিস্ফোরণ ঘটে গেল, তাতে রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রের স্পষ্ট অভিমত, শালবনীর ঘটনা রাজ্যের পুলিশ ও গোয়েন্দাদের ১০০ শতাংশ ব্যর্থতা। কাগজ পড়ে জেনেছি, জায়গাটি নাকি সি পি এমেরই ঘাঁটি, তাই সিপিএমের দুর্গে কী করে মাওবাদীরা নিঃশব্দে এ কাণ্ড ঘটালো? কেউ একবারও টের পেল না? সব বিষয়টিই রাজ্যবাসী মনে করছে এর মধ্যে যেন কিছু রহস্য কাজ করছে। কার কথা বিশ্বাস করবো? মেদিনীপুরের পুলিশ সুপারের না রাজ্য পুলিশবাহিনীর? তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই হয়তো মন্তব্য করে বলেছেন, সিপিএম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের উপর মাওবাদী হামলা আসলে সাজানো ঘটনা। অর্থাৎ বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের কনভয়ে বিস্ফোরণ তা সিপিএমের একটা স্ট্যান্ট ছাড়া কিছু নয়। মমতা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তদন্তের দাবি তুলেছে।

চিঠিপত্র

বিমানবাবু এদিন তৃণমূল নেত্রীর নাম না করে বলেন, যাঁরা ওই ধরনের মন্তব্য করছেন তাঁরা রক্ত-মাংসের মানুষের মতো কথা বলছেন না রোবটের মতো কথা বলছেন। কিন্তু আপনারা কারুর তোয়াক্কা না করে প্রবীণ মানুষ হয়েও গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করেন, আদালতের মহামান্য বিচারপতি, সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল ইত্যাদির উদ্দেশ্যে যে সব মন্তব্য করেন, সেগুলি কি রক্তমাংসের মানুষের কথা? ৩২ বছর আপনাদের শাসনে মানুষ আজ বীতশ্রদ্ধ, পুলিশ প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা সব আজ ধ্বংসের মুখে। পুলিশের কার্যকলাপে মানুষদের কোনও ভরসা নেই। পুলিশরা আজ ঠুঁটো জগন্নাথ, সি পি এম নেতা-মন্ত্রী-ক্যাডারদের কথায় চলে। যে কোনও জঙ্গি নাশকতা আটকাতে রাজ্যের পুলিশ বাহিনী যে যথেষ্ট নয় তা আরও একবার মানুষের চোখে প্রমাণ হয়ে গেল।

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বেহালা, কলকাতা

কলকাতায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সার্ধশতবার্ষিকীতে শোভাযাত্রা।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের সার্ধশতবর্ষ পালন কলকাতা দক্ষিণ-পূর্বভাগ

গত ৩০ নভেম্বর দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সার্ধশত বৎসর জন্মজয়ন্তীর দিনটিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায় শাখায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন স্বয়ংসেবকরা।

এই শ্রদ্ধাঞ্জলি কার্যক্রমের অঙ্গরূপে সঙ্ঘের কলকাতা দক্ষিণ-পূর্ব ভাগ-এর ক্ষুদিরাম প্রভাত শাখায় স্বয়ংসেবকরা নিত্যদিনের প্রার্থনার পরে একটি প্রভাত ফেরি নিয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্রভাত ফেরি ভি আই পি নগর থেকে শুরু হয়ে ই এম বাইপাস, সি এন রায় রোড, পিকনিক গার্ডেন রোড হয়ে নস্করহাট লোকনাথ বাবার মন্দিরের সামনে এসে শেষ হয়।

সেখানে একটি পথসভায় ভাগ কার্যবাহ প্রশান্ত চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, যিনি সারা বিশ্বকে জানালেন গাছেরও প্রাণ আছে, বেতার যন্ত্র যিনি আবিষ্কার করেছেন, আজ আমরা তাঁকে মনে রাখিনি। বিদেশি বিজ্ঞানীদের নিয়ে আমরা এত মাথাঘামাই যে আমাদের দেশের মহান বিজ্ঞানীদের সম্মান জানাতে ভুলে যাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আচার্য শ্রীবসুর মধ্যে সে হৃদ্যতা ছিল তিনি সে বিষয়েও আলোকপাত করেন।

বিবেকানন্দ ছাত্র চক্রের সম্মেলন

বিবেকানন্দ ছাত্র চক্র গত ৯ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবারে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

এই অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ছিল 'আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞান ভাবনা ও স্বাদেশিকতা' এবং বর্তমান বিশ্বের বহু আলোচিত বিষয় 'বিগ ব্যাং থিয়োরি'। প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুব্রত দত্ত, সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের জিষ্ণু বিসু, কল্পনা চাওলা সেন্টার ফর স্পেস ও ন্যানো সায়েন্স-এর প্রধান ডঃ শান্তনু দত্ত এবং কলকাতা স্যাস কর্পোরেশনের ক্যেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রঙ্গলাল দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক পার্থ হালদার।

কালেখাঁতলায় চিকিৎসা শিবির

সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে গত ২৩ নভেম্বর বর্ধমান জেলার কালেখাঁতলায় একটি অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ বি সি সাহা ইঞ্জেক্সন পদ্ধতিতে ৩০ জন রুগীর চিকিৎসা করেন। ধর্ম জাগরণ মঞ্চে র প্রান্ত প্রমুখ বিশ্বনাথ সাহা উপস্থিত থেকে শিবির পরিচালনা করেন।

নিহত সেনাদের প্রতি বাঁকুড়ার বার অ্যাসোসিয়েশন-এর শ্রদ্ধার্ঘ

গত ৩ ডিসেম্বর মুম্বাই-এ জঙ্গি হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভোকেটস বার অ্যাসোসিয়েশন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং নিহত সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করে।

সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শততম জন্মদিন

গত ৮ নভেম্বর সঙ্গীতাচার্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের শততম জন্মদিন পালন করল ভীষ্মদেব মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে পথ-পরিক্রমার আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তি সহ উপস্থিত ছিলেন কয়েকশ মানুষ। এই অনুষ্ঠানটিতে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তরুণ সংঘ ব্যায়ামাগার এবং বিবেকানন্দ পাঠচক্র।

দুপুরে সঙ্গীতাচার্যের পুত্র জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভীষ্মদেব মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্যরা নিউ আলিপুরে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সরণীতে গিয়ে, প্রতিটি আবাসিককে ফুল ও সঙ্গীতাচার্যের জীবনপঞ্জী কার্ড দিয়ে -শুভেচ্ছা জানিয়ে আসেন।

হিন্দী কবি কানাইয়ালাল সেঠিয়ার শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা

বিশিষ্ট রাজস্থানী কবি ও সাহিত্যিক কানাইয়ালাল সেঠিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাল রাজস্থান পরিষদের কলকাতা শাখা। গত ১৬ নভেম্বর পরিষদ কলকাতার অসওয়াল ভবনে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় রাজস্থানী সাহিত্যে কানাইয়ালাল সেঠিয়ার অবদানের কথা তুলে ধরেন সভার সভাপতি তথা বিধায়ক দীনেশ বাজাজ। 'সেঠিয়া সমগ্র'-র সঙ্কলক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী

সমাবেশ সমাচার

যুগল কিশোর জৈথলিয়াও শ্রীসেঠিয়ার সাহিত্য কর্মের কথা তুলে ধরেন। 'ছাপতে ছাপতে'-র সম্পাদক তথা তাজা টিভি-র নির্দেশক বিশ্বম্ভর নেবরও সাহিত্যিক কানাইয়ালালের অবদানের কথা ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও শ্রীশেঠিয়ার জীবন ও তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী, 'রাষ্ট্রীয় মহানগর' পত্রিকার (সান্ধ্য) সম্পাদক তথা সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য নারায়ণ জৈন, রাজস্থান পরিষদের সভাপতি শার্দুল সিং জৈন, কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শ্রীমতী মীনা পুরোহিত প্রমুখ। বড়বাজার লাইব্রেরী, বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়, অসোয়াল নবপুস্তক সমিতিসহ প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলি যৌথভাবে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

নরেশ ভবনের ৩য় প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

গত ২ ডিসেম্বর মানিকতলাস্থিত নরেশভবনে উদ্‌যাপিত হল ৩য় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এই উপলক্ষে নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী ট্রাস্ট্রের পক্ষ থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সর্বভারতীয় সহব্যবস্থা প্রমুখ গজানন বাপট। এই অনুষ্ঠানে শ্রমের দেবতা শ্রীবিশ্বকর্মার ছবির পকেট ক্যালেন্ডারও প্রকাশ করা হয়।

এদিনের আকর্ষণ ছিল বি এম এসের অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক বৈজনাথ রায় চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওই দেশের শ্রমিকদের কোনও অর্থনৈতিক বা সামাজিক স্বাধীনতা নেই। ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশে ১টি মাত্র শ্রমিক সংগঠন ছট্রট্রঠবহুগ্ন যার সদস্য সংখ্যা আড়াই লক্ষের কম।

এই চীন সফরে ভারতের মোট ৬টি শ্রমিক সংগঠনের ১১ জন অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রাজ্য সরকারি কর্মচারী সঙ্ঘের সভাপতি বীরেন পাল।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নবদ্বীপ শাখার সহ কার্যবাহ সৌরভ ব্যানার্জী তাঁর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে পুত্রবধূ অর্পিতা ব্যানার্জীকে দিয়ে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙেঘর নবদ্বীপ বিভাগ সঙ্ঘচালক বৃন্দাবন ধর গোস্বামী এই মঙ্গলনিধি গ্রহণ করেন।

অঘটন আজও ঘটে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মন্দিরে

ঘটনাটা সত্যই অভাবনীয়। রীতিমতো অলৌকিক, রোমাঞ্চ কর বলা চলে। অথচ বাস্তবের নিগড়ে গড়ে ওঠা এক অপার্থিব কাহিনী। বিস্ময়অড়িত হয়েও তার সত্যতাকে অস্বীকার করতে পারিনি। বারবার মনে পড়েছে হিমালয় কন্দরবাসী সেই গুপ্ত মহাযোগীর কথাগুলি — জানবে জগতে অলৌকিক বলে কিছু নেই। যা তোমরা বুঝতে পারো না, অনুভূতির মাধ্যমে বিদ্ধ করতে পারো না, তাকে ব্যক্ত করতে পারো না, চালিয়ে দাও তাকে একটা অস্পষ্ট শব্দ অলৌকিক দিয়ে। আসলে অতিন্দ্রিয় জগতের বহু রহস্য যে তোমাদের বোধগম্যতার বাইরে। আমাদের কাছে এসব সহজ, সাবলীল।

ঘটনার কেন্দ্রস্থল শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ মন্দির বলেই আগ্রহ বিশেষভাবে জেগে উঠেছিল। কারণ জগন্নাথদেব চিরদিনই রহস্যময়। তিনি অপ্রত্যক্ষ হয়েও ভক্তজনের কাছে প্রত্যক্ষভূত। এতো ভক্তদের ভক্তি, প্রেম বা আবেগের উৎসারণ নয়, অতি সাধারণ দর্শনার্থী যে তাঁর কৃপা-বঞ্চি ত হয় না, তা অতি বাস্তব। প্রত্যক্ষদর্শী আমি নিজেও। তাই বিস্ময়ের বারিবর্ষণে সিক্ত হইনি। মেনে নিয়েছি এও ঘটে বলে।

ঘটনার সূত্রপাত একটি বই। **'কথানুভূতিতে শ্রীজগন্নাথ'**। লেখক জগন্নাথ মন্দিরের পূর্বতন প্রশাসক রবীন্দ্র নারায়ণ মিশ্র। বইটির প্রাপ্তি বৈষ্ণব সাধিকা কনকমঞ্জরী মাতাজীর সৌজন্যে। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু শ্রীমিশ্রের প্রশাসক থাকাকালীন নিজস্ব অভিজ্ঞতার আধারে লিপিবদ্ধ কিছু বাস্তব ঘটনাবলী। কিন্তু যে ঘটনাটি আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে, নাড়া দিয়েছে, তা হল কুন্তী দেবীর আখ্যান।

মনে পড়ছে আবার সেই যোগী মহাপুরুষের কথা। জগতে কোনও ঘটনাই হারিয়ে যায় না। পৌরাণিক চরিত্রদের আবার প্রত্যাবর্তন হতে পারে ঈশ্বরের ঈপ্সায় — তাঁর লীলাভিলাষে অংশ নিতে।

কুন্তীর ঘটনাটি মনে হয় উক্ত কথার প্রতিফলন। মহাভারত বর্ণিত পঞ্চ পান্ডব মাতা মহারানী কুন্তীর মতোই তাঁর

সোমনাথ নন্দী

ঘটনানুক্রম। তিনিও পঞ্চ পুত্রের জননী। মহাভারতে কুন্তীর পাঁচপুত্রের মতো তাঁদের নাম যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব। এই পঞ্চ ভ্রাতার স্ত্রী একজন — দ্রৌপদী। বর্তমান কুন্তীর স্বামীর নামও পান্ডু। ভাসুরের নাম ধৃতরাষ্ট্র। সাত পুত্র না হলেও দ্বাদশ পুত্রের জনক তিনি। নিবাস উত্তরাখন্ডে উত্তরকাশীর এক প্রত্যন্ত পাহাড়ী গ্রাম।

গত সপ্তাহে মিশ্রজীর সাথে কলকাতায় আলাপচারিতার মধ্যে তিনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিলেন ঘটনাটির কথা।

বলেছিলেন, বর্তমানে উক্ত কুন্তী মায়ের বয়স আশি অতিক্রম করেছে। কিন্তু শরীরে অপূর্ব লাবণ্য আর সৌন্দর্যের আভার কাছে বার্ধক্যের বলিরেখা নিষ্প্রভ। প্রতি বছর হোলির সময় পাঁচ পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে তিনি আসেন জগন্নাথ মন্দিরে মহাপ্রভু জগন্নাথদেবকে আবির গুলালে স্বহস্তে চর্চিত করতে ও নিজে রঞ্জিত হতে।

মিশ্রজী বলছিলেন আর আমি মুগ্ধ, নিস্পন্দ অবস্থায় শুনছিলাম সে কাহিনী —

আমার সাথে কুন্তী মায়ের প্রথম দেখা ১৯৮৪-তে হোলির সময়। জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে। রত্নবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় চিত্তে, অশ্রুসিক্ত অবস্থায় বলে চলেছেন — হে বাসুদেব, হে কৃষ্ণ, দেবকীনন্দন এ অভাগিনী কুন্তীর প্রণাম গ্রহণ কর। তারপর আকুল হৃদয়ে করে চললেন মহাভারতে কুন্তীকৃত শ্রীকৃষ্ণ-স্তব আবৃত্তি।

রাত তখন ১১টা হবে। বিগ্রহের শয়ন বাকী। মন্দিরে ভক্ত সংখ্যা নেই বললেই চলে। স্তব শেষে কুন্তী মা নীলাদ্রিনাথকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, তাঁর পদতলে ছড়িয়ে থাকা আবির তুলে নিয়ে মস্তকে ছোঁয়ালেন ও আঁচলের খুঁট থেকে একটু আবির নিয়ে মাখিয়ে দিলেন প্রভুর চরণে সস্নেহে। তারপর গর্ভগৃহের দ্বার অতিক্রম করে এসে বসলেন দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখস্থ মন্ডপের বেদীতে। দু'চোখে তাঁর অবিরাম জলধারা। গভীর ধ্যানমগ্না।

পরের বছর (১৯৮৫) ওই একই সময়ে একই দৃশ্য। এবার কৌতূহল দ্বিগুণ হয়ে ওঠে আমার। থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম — আপনি মা, প্রতিবছর তো এখানে এই সময় আসেন, তাই না? থাকেন কতদূরে? মধুর স্বরে উত্তর দিলেন তিনি — বাবা, বহু দূরে। এখান থেকে তিন দিনের পথ। উত্তরকাশীতে। টিহরী গাড়োয়ালের এক প্রত্যন্ত গ্রামে।

কিন্তু মা আপনাকে দেখে তো মনে হয় আপনি ওড়িশার মানুষ, তাহলে—?

— ঠিক ধরেছেন, ওড়িশাতেই জন্ম আমার। বাড়ি এখানকার জাজপুরের কাছে।

নাম ছিল সৌদামিনী।

বয়স তখন আমার এগারো। বাবার সঙ্গে প্রথম পুরীতে এসেছি জগন্নাথ দর্শনে। উঠেছি নিকটবর্তী একটি ধর্মশালায়। রাতে দর্শন সেরে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ স্বপ্নে দেখলাম জগন্নাথদেবকে। মূর্তির রূপ থেকে তিনি ধারণ করলেন কৃষ্ণরূপ। শুনলাম তাঁর কণ্ঠস্বর — কুন্তী ওঠো। ঘুম ভেঙ্গে গেল। দেখলাম স্বয়ং বাসুদেব আমার সামনে। ডাকছেন ওই নামে। বললেন, এসো আমার সাথে।

তাঁকে অনুসরণ করে সিংহদ্বারের বাইশ সোপান পেরিয়ে পৌঁছালাম এখানে-এই মাজনামন্ডপে যেখানে এখন বসে আছি। এরপর প্রভু আমায় মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন — তুমি তো মহাভারতের কাহিনী জানো, কোন্ চরিত্র তোমার সব থেকে ভালো লাগে?

সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় উত্তর দিই — কুন্তীকে। শুনে তিনি হেসে উঠলেন। তারপর কিছু মনে নেই। জ্ঞান ফিরতে দেখলাম পাহাড়ি কোনও গ্রামে আছি। জানলাম জায়গাটার নাম হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চ লে কোনও গ্রাম। সেখানে অদ্ভুতভাবে আমার বিবাহ হল গাঁয়েরই একটি ছেলের সাথে। নাম ছিল পান্ডু।

কুন্তী মায়ের কথা যত শুনছি, ততই প্রবল বিস্ময়ে ডুবে যাচ্ছি। ভাবছি বিংশশতাব্দীর বুকে এও কি সম্ভব! বলে সামান্য মৌন হলেন মিশ্রজী। তারপর আবার শুরু করলেন কুন্তী মায়ের কথা —

আশ্চর্য হবেন আমার ভাসুর ঠাকুরের পরিচয় শুনে। নাম ধৃতরাষ্ট্র। জন্মান্ধ তিনি। স্ত্রীর নাম গান্ধারী। বারো পুত্রের জননী।

এরপর সামান্য স্তব্ধ থেকে বলে চললেন কুন্তী মা — ক্রমে আমি পাঁচ সন্তানের জননী হলাম। আকৃতি তাঁদের মহাভারতের পঞ্চ পান্ডবের মতো। তাঁর মধ্যে মধ্যম পুত্র ভীম যেমন বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায় তেমনি ভোজন বিলাসী। আসলে পুত্রদের এই নামকরণ নন্দনন্দনের নির্দেশ মতো। মাঝে মাঝে দর্শন দেন আমাকে পীত ধরা, মাথায় মোহনচূড়া, বংশীধারী রূপে। অধর জুড়ে থাকে ভুবন ভোলানো রহস্যময় হাসি।

তারপর তিনি সামান্য দূরে উপবিষ্ট এক যুবকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন — ও হল জেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠির। অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, কৃষ্ণপ্রেমে সদা মত্ত।

কুন্তী মা এরপর জানালেন কি চরম বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে স্বামীর মৃত্যুর পর। ভাসুর ও তাঁর ছেলেদের ষড়যন্ত্রে গ্রাম ছাড়া হতে হয়েছে। পাঁচ ছেলের সাথে পাহাড়ী রীতি অনুসারে এক কন্যার বিবাহ দিয়েছেন। পুত্রবধূর নাম দ্রৌপদী। পাঁচ পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে তিনি অন্য জায়গায় চলে গেছেন। সেখানেও ভাসুরের ছেলেরা পিছু ছাড়েনি। প্রচুর ক্ষতি করেছে। দ্রৌপদীর ও তাঁর পরনের সব কাপড় বিদ্বেষের তাড়নায় নষ্ট করে দিয়েছে। দেহের আচ্ছাদন এসেছে সম্পূর্ণ তাঁর (কৃষ্ণ) সহায়তায়। তিনি তাঁদের কাপড়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সঙ্কটের মুহূর্তে, প্রতি পদে তাঁদের সাথে থেকেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন। বিপদের মেঘ মুক্ত করেছেন। দোলপূর্ণিমায় তাঁর পাঁচ পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে যে শ্রীক্ষেত্রে আসা এ একমাত্র সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের নির্দেশে। তাঁর হোলি খেলায় অংশ নিতে।

কাহিনীটি শোনাতে শোনাতে মিশ্রজীও যেন কোনও ভাবরাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর গৌরবর্ণ মুখাবয়ব ভাবের আবেশে হয়ে উঠেছিল অরক্তিম। বললেন — কুন্তী মা ও তাঁর পাঁচপুত্র সহ পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে পরে দর্শন করে মনে হয়েছে, প্রভুর দ্বাপরলীলা আবার শুরু হয়েছে নতুন ভাবে, আপন প্রয়োজনে। সবার অলক্ষ্যে।

মিশ্রজীর অভিজ্ঞতার শেষ শব্দগুলি আমার অন্তরের অঙ্গনকে ভরিয়ে দিল এক অপূর্ব স্বর্গীয় চেতনার প্রতিভাসে। জগন্নাথ যে প্রত্যক্ষ বাসুদেব এ বিশ্বাস আমার হয়েছে কয়েকটি অভিজ্ঞতার নিরিখে। তাই মিশ্রজীর কাহিনী শুনে মনে হয়েছে বৈষ্ণব মহাজনদের সেই আপ্তবাক্যটি — 'আজো সে লীলা করেন কৃষ্ণরায় / কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়'।

আয়ুর্বেদিক বাত-ব্যাধি চিকিৎসা

রবীন সেনগুপ্ত

আর্য়ুবেদিক শাস্ত্র অনুযায়ী বাত-ব্যাধিকে মোটামুটি নয় ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা (১) পেশীবাত (Mascular Rheumatism) (২) সন্ধিবাত (Gout) (৩) কটিবাত (Lumbago) (৪) স্কন্ধবাত (Torticouis) (৫) পার্শ্ববাত (৬) খল্ঞী বেপথু বাত (৭) পাদহর্ষ (৮) বিশ্চ চী এবং (৯) গৃধসী। এর মধ্যে প্রথম তিন প্রকার বাতের নাম শুনেই বোঝা যায় যে এরা দেহের যে কোনও স্থানকে আক্রমণ করে। স্কন্ধবাতে সাধারণত ঘাড়ের পেশী আক্রান্ত হয়। পার্শ্ববাতে শরীরের পার্শ্বদেশ আক্রান্ত হয়। হাত বা মাথা কম্পিত হয় যে প্রকার বাতে সেটিই খল্ঞী বেপথু বাত। পায়ের বাতের নাম পাদহর্ষ। হাতের বাতের নাম বিশ্বচী, কটি, পৃষ্ঠ উরু, জঙ্ঘা প্রভৃতি স্থানের বাতকে বলে গৃধ্রসী। শরীরস্থ বায়ুর মাধ্যমেই রক্ত ও রস দেহে প্রবাহিত হয়। তাই দেহে বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চ য় হলে বায়ুও দূষিত হয়ে পড়ে। দেহস্থিত এই বিষ বা দূষিত বায়ু দেহের অস্থি সন্ধিতে সঞ্চি ত হয়ে যে বেদনার সৃষ্টি করে, তাকেই বাতজ ব্যাধি বলা হয়।

আমাদের দেহের রক্ত ঈষৎ লবণাক্ত। আহারের দোষে যদি দেহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অম্লরস সঞ্চ য় হয়, তাহলে ক্ষারভাগ (Alkalinity) হ্রাস পেয়ে রক্তের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়ে যায়। অম্ল ক্ষারের এই ভারসাম্যকে ত্রুদ্র ব্যালান্স বলা হয়। বাতজ ব্যাধির ক্ষেত্রে PH ব্যালেন্স একটা ফ্যাক্টর হিসাবে দেখা দিতে পারে। শারীরিক পরিশ্রম কম করলেও অস্থি সন্ধিগুলিতে অচলাবস্থা থেকে বাত সৃষ্টি হতে পারে।

বাতজ ব্যাধির জন্য বহু প্রকার আয়ুর্বেদিক ঔষধ তো রয়েছেই তার সাথে যথারীতি রয়েছে যোগাসন ও নানা প্রকার প্রাকৃতিক চিকিৎসা। যথা সায়াটিকার বেদনা আর মাজাব্যাথার বেদনায় গরম সেঁক সাময়িক ভাবে কাজ দেয়। স্যাৎসেঁতে স্থানে শয়ন, রৌদ্রহীন স্থানে গৃহ ইত্যাদিও বাতজ ব্যথা বৃদ্ধির কারণ। ভ্রমণ প্রাণায়াম,

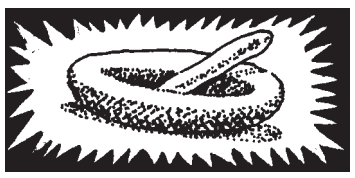

নিরাময়

সর্বাঙ্গাসন, উষ্ট্রাসন, হলাসন, শীর্ষাসন ইত্যাদি আসন সমূহ অবস্থা বুঝে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় নিয়মিত ব্যবহার করলে বাতজ যন্ত্রণার ক্ষেত্রে সুফল মেলে। সাধারণত আলাদা ধরনের বাতজ ব্যাধির জন্য আলাদা প্রকার ঔষধের ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু এমন আয়ুর্বেদিক ঔষধেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যেটি প্রায় যেকোনও ধরনের বাতজ ব্যথার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ঔষধটিকে শাস্ত্রে রাজবল্লভ তৈল নামে উল্লেখিত আছে। এই তেল নির্মাণ করতে গেলে বেড়েলার ক্বাথ শতসের ও তৈল ষোল সের একত্রে পাক করতে হয়। পাক কালে যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন, উৎপল, পদ্ম, ছোট এলাচ, অজুরু, নাগকেশর, অশ্বগন্ধা, জীবনীয় এই সমস্ত দ্রব্যের সাথে দুগ্ধ বত্রিশ সের দিতে হয়। এগুলিকে হাল্কা আঁচে পাক করতে হয় এবং রূপার পাত্রে সংরক্ষিত করতে হয়।

ধনিয়া, নিম্ব, মুথা, পটোল পত্র, গুড়ুচী ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ মধু সহযোগ পান করলেও বাত রোগ বিনষ্ট হয় বলে গরুড় পুরাণ শাস্ত্রের পূর্বখন্ডের ১৭৯ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে উল্লেখ করা আছে।

শিরীষগাছের ছালের ক্বাথ, চিনি দিয়ে সেবন করলে বাতের ব্যথার উপশম হয়।

কোতরাণী, ঘোলের সাথে বেঁটে, সপ্তাহ খানেক সেবন করলে বাত দূরীভূত হয়।

ঈশ্বরমূল ও মরীচ ২১টি বেঁটে খেলে বাত রোগে কাজ দেয়।

ভেরেন্ডার তেল আধপোয়া ও সৈন্ধবলবন লৌহপাত্রে গরম করে লেপন করলে বাত ব্যথার কাজ দেয়।

তবে বাতজ ব্যাধিকে সদাসর্বদা চিকিৎসা দ্বারা দূরীভূত করা সম্ভব হয় না। ভালো হয়েও পুনরায় বাতে আক্রান্ত হতে অনেককেই দেখা যায়। এমনকি পশুরাও বাতে পঙ্গু হয়ে যায় অনেকসময়। ঔষধ-পত্রের সাথে নিয়মাবলী ও ব্যায়ামাদির আশ্রয় না নিলে বাতে পঙ্গু হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অঙ্গনা

নারী শিক্ষায় শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ

।। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত ।।

জয়ন্তী ভট্টাচার্য

দীর্ঘকাল ধরে আমাদের নারী সমাজ লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হয়ে এসেছে। সেকালে অন্দরমহলের চার দেওয়ালের মধ্যে তাদের গণ্ডী ছিল সীমাবদ্ধ। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেব এল নারী স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ কি তা অবশ্যই জানা দরকার। স্বাধীনতা ভাল, কিন্তু তার অপব্যবহার কাম্য নয়। শ্রী শ্রী সারদামণিও নারীমুক্তি, নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতার কথা বিশেষভাবে বলেছিলেন। তাঁর ভাব ছিল আলাদা, তাঁর বিশ্লেষণও ছিল অন্যমাত্রায়।

সমাজ-সংসারে নারীর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। নারী সমাজের ধারক। শক্তিরূপিণী নারী সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষাও যেমন করতে পারে, তেমনি ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতেও পারে। ইতিহাসের পাতায় তার নজিরও পাওয়া যায়। নারীই পারে সুস্থ সমাজ জীবনের প্রতিষ্ঠা করতে, যা আজকের যুগে খুবই প্রয়োজন। প্রকৃত নারীশিক্ষা বলতে পাঠ্য-পুস্তকের সীমিত পড়াশোনা বোঝায় না, সমাজে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দিকেই দৃষ্টি রেখেই বলতে হবে প্রকৃত শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা সমাজ ও সংসারের পক্ষে মঙ্গলকর। বস্তুত নারীই অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী। সমাজ সংসার রক্ষার দায়িত্ব তাঁর। প্রকৃত শিক্ষা, কোনও কিছু গঠনে সাহায্য করে, ধ্বংসে নয়।

নারীর কমনীয়তাও সংসারে প্রয়োজন। সংসার সমাজকে উপেক্ষা করে নিজেদের ইচ্ছায় চালিত হলে সমাজে অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। সমাজে নারীর অসামান্য ভূমিকার কথা মনে রেখে প্রকৃত নারী শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন। শুভবুদ্ধি সম্পন্না নারীর কাছে সংসার পবিত্র মন্দিরের মতো। সংস্কারের কল্যাণ সমাজে মঙ্গল আনয়নে সহায়তা করে এবং সেইখানেই হয় নারীজীবনের সার্থকতা।

গর্ভধারিণী জননীর মধ্য দিয়েই নারীর সঙ্গে সন্তানের পরিচয় হয় — সেই ক্ষেত্রে নারী যখন জননীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন তাকে অনেক দিক থেকে সহনশীলতার সম্মুখীন হতে হয়। পুঁথি থেকে যে কোনও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভকেই পুঁথিগত বিদ্যা বলা হয়। বর্তমান যুগে নারী শিক্ষা শুধুই পাঠ্য-পুস্তকের জ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ এবং তাও আবার পাঠ্য পুস্তকের বক্তব্যগুলি নিজেদের ভাবাবেগ দিয়েই বিশ্লেষণ করছে। নিজেদের ইচ্ছামত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করছে। বর্তমানে নারী শিক্ষার বিষয়টিও সেইভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখানে নারী শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে আমাদের মনে পড়ে যায় শ্রীশ্রী মায়ের আদর্শ জীবনের কথা। তাঁর ভাষায় — পুঁথিগত বিদ্যাই শিক্ষা নয়। প্রকৃত নারীশিক্ষার জ্বলন্ত উদাহরণ হল শ্রীশ্রী মায়ের জীবনী। তাঁর দীর্ঘ জীবন, কর্ম, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, কর্মকুশলতা, শান্তধী, দৃঢ়তা, ক্ষমা প্রতিটি গুণ ও কর্মের এক অপূর্ব নিদর্শন স্বরূপ। সারদা মায়ের জীবনের প্রতিটি ক্ষণই শিক্ষার মূলমন্ত্র বলে মনে ভাবলে তা কিছুমাত্র ভুল নয়। তাঁর জীবনের আদর্শের ভাব নিয়ে যদি কোনও একটি নারী একটি অংশও পালন করে, তবে তাঁর সংসারও সমৃদ্ধ হতে পারে।

নারী হচ্ছে সমস্ত সভ্যতার ও শক্তির ধারক। পুঁথিগত সমস্ত জ্ঞানকে প্রয়োগ করাই পুঁথিগত জ্ঞানের মূল্য, কিন্তু তা হয় না। শ্রীশ্রী সারদাদেবী নারীদের উন্নতির জন্য যে কোনও কাজ, বিশেষত তাদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ ও সমর্থন ছিল। মেয়েরা আধুনিক কালের উপযোগী শিক্ষা ও কাজকর্ম শিখবে, এটা মা সারদাদেবী চাইতেন। তাঁর ভাইঝি রাধু ও মাকুকে তিনি স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন এবং তাদের উৎসাহ দিয়ে বলতেন — লেখাপড়া ও কাজকর্ম শিখলে নিজেরাও সুখে থাকবে, অপরকেও সুখী রাখতে পারবে। তাঁদেরও উপকার হবে। আজকের যুগে এ কথা প্রমাণিত ও সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ ঘরে ঘরে শিক্ষার প্রভাবে মূর্খতা দূর হয়েছে, ঘরে ঘরে স্বাবলম্বী হয়েছে নারীরা। নারী মুক্তি নারী আন্দোলন সম্পর্কে মায়ের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত ছিল। তিনি দেখতে চেয়েছেন নারীকে একটি প্রকৃত সত্তার অধিকারিণী হিসেবে। নারীসমাজ তাদের নিজস্ব সমস্যার সমাধান নিজেরাই করবে, কোনও পুরুষের সাহায্য গ্রহণ না করেই। গৌরীমা তার জীবন্ত উদাহরণ। গৌরীমা তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মের মধ্যে দিয়ে ছাত্রীদের নিয়ে আশ্রম বিদ্যালয় গঠন কার্য চালালে মা সারদা তাঁকে ডেকে বলেছিলেন, মেয়েদের বুঝিয়ে দিও তারা যেন কোনও 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়' করতে না আসে। পরে গৌরীমা'র প্রশংসা করে বলেছিলেন — এই যে গৌরীদাসী, কি মেয়ে — ওর মত কটা পুরুষ আছে; এই স্কুলে বাড়ি গাড়ি সব করে ফেললো। এটাই নারী চরিত্রের মূল উদাহরণ— রক্ষক রূপে ত্রাতা রূপে। বর্তমান যুগে নারী চরিত্রের দৃঢ়তার প্রসঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তেজস্বিতার প্রসঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণির কথা বলা যেতে পারে। পরাধীন জাতির কালিমা ভেদ করে এই মহীয়সী নারীর তেজস্বিতা সময়ে সময়ে এমন বিপুল গরিমায় প্রকাশিত হত যে তাঁর সম্মুখে প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ প্রভুকেও অবনত হতে হত। হিন্দুদের ধ্যানপরায়ণতা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিলাভের একটি উপায়। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের নীতিগুলি আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে — শিক্ষা কেমন ভাবে হবে! এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলা উচিত, প্রথমে মাতৃভাষা মারফত পুরোপুরি শিক্ষা চাই। তারপর সংস্কৃত শিক্ষা, তারপর ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত এর সঙ্গে হাতের কাজ, সূচীশিল্প, কুটির শিল্প, রন্ধন, শুশ্রূষা, পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান যেমন শেখানো হবে, তেমন জানতে হবে ভারতীয় আদর্শ ঐতিহ্যের কথাও। বর্তমান যুগে নারীর মধ্যে মাতৃত্ব ভাবেরই অভাব। উচ্ছৃঙ্খলতার একটা রূপ দেখতে পাই। আগে মাতৃত্বের রূপেই ভারতবর্ষ গর্বিত ছিল। কিন্তু আজ তা কোথায়! ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে স্বামীজীর চিরপ্রসিদ্ধ উক্তিটি স্মরণ করা যেতে পারে — 'ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ, সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী।' স্বামীজীর লেখার মধ্যে আর একটি নাম উল্লেখ ছিল না, উল্লেখের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন পরিবেশ উপযুক্ত ছিল না। অথচ তিনি সশরীরে বিরাজমান ছিলেন। সেই বিশুদ্ধ মাতৃত্বের জীবন্ত বিগ্রহ — 'মা সারদা'।

চিত্রকথা ।। ভক্ত ও ভগবান ।। পঁচিশ

মহামানব বুদ্ধ দেবের অহিংসা মন্ত্র এবং আজকের সন্ত্রাসবাদ

দেবজ্যোতি রায়

৬১০ খৃস্টাব্দে পৃথিবীতে ১ জন লোক মুসলমান ছিলেন। মাত্র ১৪০০ বছরের মধ্যে ১ জন থেকে বেড়ে তারা ১২৩ কোটি হলেন কি করে? এভাবে চলতে থাকলে আগামী ১০০ বছর পরে পৃথিবীর শতকরা কতজন মানুষ বৌদ্ধ এবং হিন্দু হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবেন?

সাম্য-মৈত্রী ও করুণার মূর্ত প্রতীক মহামানব বুদ্ধ দেবকে আমরা যদি এই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে গণ্য করি, তাহলে সম্ভবত আমাদের ভুল হবে না। ১৯৫২-তে ছোট্ট একটি বই-এ পড়েছিলাম, এক সময় পৃথিবীর শতকরা ৩৩ জন লোক বৌদ্ধ ছিলেন। সম্ভবত এই তথ্যটি বেশ পুরানো ছিল। আজকের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬২৫ কোটির কাছাকাছি। এদের মধ্যে ২০৪ কোটি খৃস্টান, ১২৩ কোটি মুসলমান এবং ৮৩ কোটি হিন্দু। সমগ্র পৃথিবীতে বৌদ্ধ দের সংখ্যা মাত্র ৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ। শতকরা হিসেবে মাত্র ৬ জন। বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি ভারতের অবস্থা আরও শোচনীয়;শতকরা ১ জনেরও কম। (মনোরমা ইয়ার বুক, ২০০৮) এইসব তথ্য আমাদের বড্ড বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। ৬১০ খৃস্টাব্দে পৃথিবীতে ১ জন লোক মুসলমান ছিলেন। মাত্র ১৪০০ বছরের মধ্যে ১ জন থেকে বেড়ে তারা ১২৩ কোটি হলেন কী করে? এভাবে চলতে থাকলে আগামী ১০০ বছর পরে পৃথিবীর শতকরা কতজন মানুষ বৌদ্ধ এবং হিন্দু হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবেন? এ প্রসঙ্গে আমি একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ ডঃ আম্বেদকরের চিন্তাধারার কিছু অংশ তুলে ধরব। এই মনীষী জন্মেছিলেন হিন্দু সমাজের এক তথাকথিত অস্পৃশ্য পরিবারে। ১৯৫৬-এর ১৪ অক্টোবর তিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের সংবিধান রচনার আগে তিনি পৃথিবীর সব ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ ভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইসলাম এবং খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের আগে তিনি'বুদ্ধ এবং তার ধর্ম' নামে একখানি গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রকাশের আগে এর পাণ্ডুলিপি ভারত এবং বহির্বিশ্বের অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাদের অনেকেই ডঃ আম্বেদকরের অনেক মন্তব্য ও সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে চাননি। কিন্তু দিনে দিনে ভারত তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মুসলিম সন্ত্রাসবাদ তথা জঙ্গিবাদের তাণ্ডব দেখে অনেকেই বলছেন, বাবাসাহেব সঠিক কথাই লিখে গেছেন।

বাবাসাহেব কি কথা লিখে গেছেন, তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আপনারা বিশ্লেষণ করবেন। জন্মসূত্রে আমি হিন্দু। ব্যক্তিগত জীবনে যে সব নীতি মেনে চলার চেষ্টা করছি তার প্রায় সবটাই বাবাসাহেবের ব্যাখ্যা করা বৌদ্ধ নীতি। আমাদের মধ্যে অনেকেই আজও বিশ্বাস করেন, বুদ্ধ দেব অহিংসা (অক্রোধ) দিয়ে হিংসাকে (ক্রোধ) জয় করতে বলেছেন। তিনি জীবহত্যার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এক কথায় তিনি পরিপূর্ণ অহিংসা, ভাষান্তরে নিরঙ্কুশ অহিংসার উদ্ভাবক এবং প্রচারক ছিলেন। আমার বাবা ছিলেন প্রচলিত অহিংস নীতির একনিষ্ঠ সমর্থক। তাঁর নির্দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময়ই আমার পড়ার ঘরে কাঁচা হাতে লিখে রেখেছিলাম 'অহিংসা হি পরমো ধর্ম'। পূর্ববঙ্গের তথা ভারতের হিন্দু-বৌদ্ধরা প্রায় সকলেই সার্বিকভাবে অহিংসা তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। আমি অনেক কট্টর অহিংস কৃষক দেখেছি যারা ফসল অনিষ্টকারী ইঁদুরও মারতেন না। ফাঁদ পেতে জ্যান্ত ইঁদুর ধরে দূরে কোনও জঙ্গলে ফেলে আসতেন। আজও অনেকে ওই তত্ত্ব বিশ্বাস করেন। কিন্তু তারা বা আমরা (হিন্দু-বৌদ্ধরা) খুন, ধর্ষণ, রাহাজানির মতো পাশবিক অত্যাচারকে আটকাতে পারিনি। পুতুল পূজারী হবার অপরাধে ২০০১-এও শত শত নিষ্পাপ সন্ন্যাসী 'জ্ঞান জ্যোতিদের' মাথা কেটে নেওয়া হয়েছে। অনেককে জীবন্ত অবস্থায় হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদে এতটুকু সরব হতে পারিনি। আমার বিশ্বাস অহিংসার অপপ্রয়োগের কারণেই এমনটি ঘটেছে এবং ঘটছে। অলৌকিক কোনও ঘটনা না ঘটলে আগামী ২৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হিন্দু এবং বৌদ্ধশূন্য হয়ে যাবে।

বিনম্রভাবে বলছি, ডঃ আম্বেদকর মহামানব বুদ্ধ দেবকে সাম্য-মৈত্রী এবং করুণার মূর্ত প্রতীক বলে চিহ্নিত করেছেন, বারবার তাঁর ক্ষমা ও ঔদার্যের প্রশংসা করেছেন। এরই সঙ্গে তিনি বলেছেন, বৌদ্ধ দর্শনের কোথাও নিরঙ্কুশ অহিংসার কথা নেই। বুদ্ধ দেব অহিংসার কোনও সংজ্ঞাই দেননি। ডঃ আম্বেদকরের ভাষায় — "Lord Buddha has no where given any definition of Ahimsa. (From : Buddha And His Dhamma, 11th Vol. of Dr. Ambedkar's Writings and Speeches, 4th Edition, 1991, p-346-47) নিরঙ্কুশ অহিংসার স্রষ্টা ছিলেন মহাবীর জৈন। বুদ্ধ দেব নন। জীব-হত্যা মহাপাপ, এমন কথা বুদ্ধ দেব কখনও বলেননি। বরং প্রয়োজনে জীব-হত্যাকে সমর্থন করেছেন তিনি। জীব-হত্যাকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন — ইচ্ছাকৃত জীব হত্যা (Will to kill) এবং প্রয়োজনে জীব-হত্যা (Need to kill)। তিনি ইচ্ছাকৃত জীব-হত্যাকে সমর্থন করেননি। পক্ষান্তরে তিনি প্রয়োজনে জীব-হত্যা করাকে সমর্থন করেছেন। আম্বেদকর বলেছেন — "Buddha meant to make a distinction between will to kill and need to kill. He did not ban kiling where there was need to kill. He (Buddha) did not make ahimsa a matter of Rule. He enunciated it as a matter of principle or way of life. Jainism has in it the will never to kill. (পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৩৪৬-৪৭ নং পৃষ্ঠা দেখুন)

কিন্তু শত শত বছর ধরে সর্বত্র এ কথাই প্রচারিত হয়েছে যে, বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি দু'টি — 'অহিংসা পরম ধর্ম' এবং 'জীব-হত্যা মহাপাপ'। এই অপপ্রচারের ফল হয়েছে মারাত্মক। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোককে অস্ত্রহীন করে দিয়েছিল এই প্রচার। ভারতে ইসলামের আগমন পর্যন্ত বৌদ্ধরা তো যুদ্ধের নামেই শুনতে রাজী ছিলেন না। হিন্দু ব্রাহ্মণরাও অনেকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বৌদ্ধদের অনুসরণ করতে গিয়ে অনেক হিন্দু নিরামিষভোজী হয়ে গেছেন। অনেক হিন্দুও যুদ্ধ তো দূরের কথা, অস্ত্র পর্যন্ত স্পর্শ করতেন না। আজ বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের বড় একটি অংশ অহিংসার পক্ষে এবং জীব-হত্যার বিপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলেন।

আজ আমরা যে 'সপ্তশতী গীতা' দেখছি তার মধ্যে যেমন আছে অহিংসার কথা, ঠিক তেমনি আছে হিংসার কথা। একদল গবেষক বলছেন, বৌদ্ধ ধর্মগুরু গৌরপাদের শিষ্য ছিলেন আদি শঙ্করাচার্য। এই কারণে আদি শঙ্করাচার্যকে 'প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ' বলা হয়। গুরু-শিষ্য দু'জনে মিলে গীতায় অহিংসা এবং হিংসার সমন্বয় সাধন করেছেন। অধিকাংশ বৌদ্ধ পণ্ডিত আজও গীতায় বর্ণিত যুদ্ধ তত্ত্ব বা হিংসা তত্ত্ব আদৌ স্বীকার করেন না। আজকের হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে তারা অহিংসার অস্ত্র দিয়ে হিংসাকে জয় করার কথা বলেন। আজ দুনিয়াব্যাপী যে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বাড়বাড়ন্ত তাও নাকি অহিংসার অস্ত্র দিয়ে জয় করা সম্ভব। আমরা এটিকে একটি দুরারোগ্য রোগ বলে চিহ্নিত করতে চাই। ভারতে হাজার হাজার হিন্দু পণ্ডিত আছেন যারা মুখে গীতায় বিশ্বাসী এবং কার্যক্ষেত্রে অহিংসায় বিশ্বাসী। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ অভয় চরণ ভক্তিবেদান্ত গীতার মধ্যে হিংসা খুঁজে পাননি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মসূত্রে হিন্দু। কিন্তু তিনি হিন্দুদের উপনিষদ ছাড়া অন্য কোনও ধর্মগ্রন্থে তেমন একটা বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জীব-হত্যার কট্টর বিরোধী ছিলেন। 'বিসর্জন' নাটক লিখে তার প্রমাণ রেখেছেন। তিনি পঞ্চ মুখে বুদ্ধ দেবের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পতন সম্পর্কে কোনও কথাই বলেননি। জীব-হত্যা বাদ দিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব কিনা তাও বলেননি।

গান্ধীজী প্রচলিত অহিংস তত্ত্বে গভীর ভাবে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন। তিনি গীতায় বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কে স্বীকার করেননি। তাঁর একান্ত অনুগামী আচার্য বিনোবা ভাবে ১৯৬২-তে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, ভারত সরকার চীনের বিরুদ্ধে যেন যুদ্ধ না করে। তাঁরা বুঝতে চাননি যে, দেশ রক্ষার ব্যাপারে অহিংসার কোনও স্থান নেই। একজন সৈনিক যদি মনে প্রাণে অহিংস হন, জীব-হত্যাকে পাপ বলে মনে করেন, তবে তিনি যুদ্ধ করবেন কি করে?

ডঃ আম্বেদকর সমস্যাটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ভাবে বুঝেছিলেন। তাই তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার আগেই এই ধর্মের দোষ ও গুণাবলী বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের পতনের কারণগুলি ঠিক ঠিক ভাবে বর্ণনা করেছেন তাঁর লেখা 'The Decline and Fall of Buddhism'-শীর্ষক নিবন্ধে। আমরা প্রথম যখন এই নিবন্ধটি পড়ি, তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। নিজেদের কাছে প্রশ্ন করেছি এসব কথা কি সত্যি? বাবাসাহেব (ডঃ আম্বেদকর) মিথ্যা বলেননি তো? ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বৌদ্ধ বন্ধুদের কাছে যখন এই নিবন্ধের বক্তব্য বলেছি, তখন তারাও বিষয়ে হতবাক হয়ে গেছেন। অনেকে বলেছেন, যেহেতু ডঃ আম্বেদকরের মতো পণ্ডিত ব্যক্তি এ কথা লিখেছেন, তাই কোনও মন্তব্য করব না।

কি বলেছেন বাবাসাহেব এই নিবন্ধে? তিনি বলেছেন, 'একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মুসলমানদের আক্রমণের ফলেই ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটেছে। 'বুত' ছত্রভঙ্গ বলে আরবি ভাষায় একটি শব্দ আছে। এর অর্থ পুতুল বা প্রতিমা। এই 'বুত' শব্দটি কোথা থেকে এলো তা অনেকেই জানেন না।

'বুত' হচ্ছে 'বুদ্ধ' শব্দটির অপভ্রংশ। এই 'বুত' বা 'বুদ্ধের' শত্রু হিসেবেই ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। মুসলমানদের কাছে পুতুল পুজো এবং বৌদ্ধ ধর্ম সমার্থক। মুসলমানরা পুতুল ধ্বংস করে বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করতে আগ্রহী। শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর যেখানে যেখানে ইসলাম গেছে সেখানে সেখানেই তারা বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করেছে। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে পার্থিয়া, গান্ধার, চীনের অধীন তুরস্ক তথা সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচলিত ছিল। এইসব দেশের বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করেছে ইসলাম। দেখুন : মহারাষ্ট্র সরকার প্রকাশিত বাবাসাহেবের ইংরেজী রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ - ২২৯-২৩০।

স্বল্প পরিসরে বাবাসাহেবের এই নিবন্ধটি নিয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব হচ্ছেনা। আগ্রহী বন্ধুরা এটি পড়ে দেখতে পারেন। আজ ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বে সাম্প্রদায়িক অশান্তি বলতে মূলত মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব এবং এ থেকে উদ্ভূত অশান্তিকে বোঝায়। জঙ্গিবাদ বলতে মুসলিম জঙ্গিবাদকে বুঝায়। মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রে প্রধান কথা হচ্ছে পৌত্তলিকতাকে নির্মূল করা। তাদের দৃষ্টিতে হিন্দু এবং বৌদ্ধরা সবচেয়ে বড় পৌত্তলিক। এদের ধ্বংস করার জন্য তাদের ধর্মশাস্ত্রে কম করেও এক হাজার বিধান (আয়াত) আছে। মুসলমানরা বৌদ্ধদের দেশ আফগানিস্তানকে দখল করে সেখানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করেও সন্তুষ্ট হয়নি। বিশ্ব ভাস্কর্যের অমূল্য অবদান বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তারা। আমরা ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধরা অতি সন্তর্পণে 'আহা-উহু' করেছি মাত্র। এখানকার শাহী-অশাহী ইমাম সাহেবরা খুশিতে ডগমগ ছিলেন। পৌত্তলিকতার নির্মূলের জন্য যে সব বিধান আছে ওদের ধর্মশাস্ত্রে আমরা খবরও রাখি না। ১৯.১০.২০০৮ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় (পৃ-২০) প্রকাশিত খবরে প্রকাশ মুসলিম মৌলবাদীরা ঢাকার সব মূর্তি, ভাস্কর্য গুঁড়িয়ে দেবার হুমকি দিয়েছে।

আমরা আমাদের ধর্ম ও দেশ রক্ষার ভার ভগবান অথবা বুদ্ধ দেবের উপর ছেড়ে দিয়েছি। এর ফলেই ভারতের আয়তন দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। বৌদ্ধ ধর্ম লুপ্তপ্রায়। নিবন্ধের কলেবর না বাড়িয়ে বাবাসাহেবের বলা অতি মূল্যবান দু'টি কথা বলে আজকের মতো এখানেই শেষ করব। তিনি বলেছিলেন, 'আমি প্রথমে ভারতীয়, শেষে ভারতীয় এবং ভারতীয় ছাড়া কিছুই নই।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, ভারতকে রক্ষা করার জন্য আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করব।' আমাদের দৃষ্টিতে আত্মরক্ষা এবং দেশ রক্ষার চেয়ে বড় ধর্ম কিছু হতে পারে না। দেশপ্রেমের চেয়ে বড় প্রেম কিছু হতে পারে না আমরা ইচ্ছাকৃত জীব হত্যা করব না;কিন্তু আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধ বা জীব হত্যায় পিছপা হব না। আমরা মনে করি এটা বুদ্ধ দর্শনের অন্যতম স্তম্ভ।"

শিশু দিবসে সংস্কার ভারতীর শিশু-কিশোর নাট্যমেলা

নীলাঞ্জনা রায় ।। গত ১৪ নভেম্বর কলকাতার গিরিশ মঞ্চে শিশু-কিশোর নাট্য মেলায় সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে পরিবেশিত হল চারটি শিশু নাট্য এবং একটি নৃত্যালেখ্য। মঞ্চে নটরাজ মূর্তিতে মাল্যার্পণ করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় নাট্য প্রমুখ বিমল লাট। শিশু-কিশোর নাট্য মেলার মুখ্য রূপকার হিসাবে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ শাখা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল প্রতিষ্ঠানের পূর্বাঞ্চল প্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্যকে। অনুষ্ঠানে প্রথম উপস্থাপনা ছিল 'কথামালার দেশে'। পশুরাজ সিংহকে রোজ একটি করে শিকার পাঠাতে হতো তার উদর পূর্তির জন্য। এক দিন খরগোশের যাওয়ার পালা। পথে যাবার সময় কুয়োর জলে নিজের ছায়া দেখে তার মাথায় এক বুদ্ধি এল, সেইমতো সে সিংহকে আর একটি সিংহের কথা বলে তাকে কুয়োর সামনে নিয়ে এল। সিংহ কুয়োর জলে নিজের ছায়া দেখে ভাবল অন্য সিংহ এসেছে। আর তাকে মারবার জন্য কুয়োর জলে ঝাঁপ দিয়ে নিজেই মরে গেল। বনের পশুরা বিপদ থেকে মুক্তি পেল। কথামালার এই শিক্ষামূলক গল্প নিয়ে ৩ থেকে ৫ বছরের মোট ২৮ জন শিশু মুখোশ নাটক করল তেলেঙ্গাবাগান-মুরারীপুকুর প্রাক্ প্রাথমিক স্কুল দ্য হোলি একাডেমী। এদের তালিম দিয়েছেন সংস্কার ভারতীর সুপ্রীতি ভদ্র (দাস) ও অদিতি চৌধুরী। দু-চার জন বেশ ভালো করলেও বাকীরা নিজেদের ইচ্ছেমতোন হেঁটে চলে বেড়িয়েছে। তবে ৩-৪ বছরের ক্ষুদে অভিনেতারা যা করে দর্শক তাই উপভোগ করেন।

এদিন সন্ধ্যার দ্বিতীয় নিবেদন সংস্কার ভারতীর শিশু-কিশোর বিভাগের নাটক "লড়াই বনাম রসমালাই"। এক খাদ্য রসিক রাজার রাজত্বে যুদ্ধ বিগ্রহ নেই, প্রজাদের কোনও নালিশ নেই, সবাই সুখ-শান্তিতে থাকে। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা শুধু যুদ্ধ করে বেড়ান, তাঁর সৈন্যদের চোখে ঘুম নেই, পেটে খাবার নেই। লড়িয়ে রাজা এলেন খাইয়ে রাজার রাজ্য আক্রমণ করতে। খাইয়ে রাজা তাঁকে ডেকে আদর করে বসিয়ে বললেন যুদ্ধ তো হবেই। তার আগে একটু খাওয়া-দাওয়া করে নিন। সৈন্যরাও একটু খেয়ে নিক। খাওয়া-দাওয়া করে লড়িয়ে রাজার চোখে ঘুম। সেনারাও ঘুমে কাদা। যুদ্ধ আর হলো না। লড়িয়ে রাজা যাবার সময় কয়েকজন রাঁধুনী নিয়ে গেলেন। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা নাটক ও সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হল। তাঁকে সাহায্য করলেন প্রদীপ দাস। ১৭ জন শিল্পীর মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখে বিশাল, প্রীতম, অমিয়, শঙ্কর, প্রমুখ। অনুষ্ঠানের তৃতীয় নিবেদন ছিল বিশিষ্ট ছড়াকার পূর্ণেন্দু পাত্রীর মজার নাটক 'রাম রাবণের ছড়া'। উপস্থাপনায় রাজারহাট লাউহাটি সন্নিহিত গ্রামীণ মাধ্যমিক চাঁদপুর হাইস্কুলের ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীরা। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে মজার ঘটনা এবং সংলাপ সব ছড়ায়। এক অভিনব প্রয়াস। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন ইছাহক মোল্লা, রাকিবুল গাজী, তুহিনশুভ্র পাল প্রমুখ। সংস্কার ভারতীর পক্ষে এদের তালিম দিয়েছেন ঋত্বিক কুণ্ডু, সহায়তায় ছিলেন পার্থ মুখোপাধ্যায় ও শ্রাবণী হালদার।

একটু স্বাদ বদল হল চতুর্থ নিবেদনে।

"একটি গাছের গল্প" নৃত্যালেখ্য পরিবেশন করল লেক গার্ডেনস্-এর 'প্রতিভা' নৃত্যশিক্ষালয়। মঞ্চ জুড়ে ৩০ জন ছোট্ট শিল্পী একটি গাছের সারাদিনের ঘটনা ফুটিয়ে তুলল। প্রজাপতিদের মধু খাওয়া, স্কুলে যাবার পথে বাচ্চাদের গাছের তলায় বসে পথচারীদের বিশ্রাম আর সব শেষে গাছ কেটে কাঠ নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে পরিবেশ বাঁচাও — গাছ বাঁচাও এই কথাই যেন এরা নাচের মধ্যে দিয়ে বলে গেল। নেপথ্যে ছিল শুধু আবহ সঙ্গীত। সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে নৃত্য নির্দেশনায় ছিলেন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী সংযুক্তা সেনগুপ্ত। নৃত্যে তপোজা ব্যানার্জী, সায়ন্তনী মজুমদার, বংশিকা চাটিয়া, ইভা

চাঁদপুর হাইস্কুলের 'রাম-রাবণের ছড়া'।

কাপুরের নাম উল্লেখযোগ্য।

এই দিনের আশাতীত পাওনা ছোট ছোট শিশু শিল্পীদের ঐতিহাসিক নাটক "রাজযোগী"। ছত্রপতি শিবাজীর জীবনের কিছু ঘটনা ও রামদাস স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। উৎস শচীন সেনগুপ্তের "গৈরিক পতাকা"। বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ অনুমোদিত দমদম রোডের গীতা দেবী সরস্বতী শিশু মন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীরা সুন্দর অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলল শিবাজীর জীবন। ছত্রপতি শিবাজী ও রামদাস স্বামীর ভূমিকাভিনেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ ও অতনু ব্যানার্জীর মধ্যে ভালো অভিনেতা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। জিজাবাঈ চরিত্রে অবন্তিকা ব্যানার্জী, তানাজীর ভূমিকায় তন্ময় জানা, মেহেরবাণী প্রেরণা চৌধুরী সহ মোট ৩০ জন অভিনয় করেছেন। সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে এদের তালিম দিয়েছেন বিকাশ ভট্টাচার্য। সাহায্য করেছেন আলপনা বোস, শিখা সরকার, ঈষিতা রায় ও শম্পা ভট্টাচার্য।

অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে জানা গেল তাঁরা শিশু-কিশোরদের নাচ, গান, আঁকার বিষয়ে আগ্রহী। কারণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তাকাবার তাদের অবকাশ নেই। স্বভাবতই সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি রুচি বোধ গড়ে ওঠে না, যা প্রাথমিক ভাবে প্রজন্মের চরিত্র গঠনে প্রয়োজন।

সংস্কার ভারতীর পশ্চিমবঙ্গ শাখা গরমের ছুটি ও পুজোর ছুটিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে ৫ থেকে ১৫ বছরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কয়েকটি কর্মশালা ভিত্তিক নাট্য প্রযোজনা করার প্রচেষ্টা নিয়েছিল তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে। এই প্রচেষ্টার সফল মঞ্চায়ন করল ১৩০ জন ছোট্ট শিল্পী জাতীয় শিশুদিবসের সন্ধ্যায়। উল্লেখ্য, সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ শাখার পরিকল্পনা প্রতি বছর শিশু দিবসে হবে এই শিশু কিশোর নাট্য মেলা।

শব্দরূপ - ৪৮৯

ইলা পাল

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	৫		■	৬		৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮			৯	■	১০		■
■	■	■	১১			■	১২
১৩				■	১৪		

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. শিব, আগাগোড়া বাণ, ৩. 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' প্রণেতা প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি, ৪. আরবি শব্দে সম্মানসূচক সম্বোধন, ৫. ইঙ্গ শব্দে চাটু, কড়াই, ৬. শিল্প-সাহিত্যের উপভোগে আকস্মিক ছেদ বা বাঁধার সৃষ্টি, ৮. নালতে পাতা, নালিতা, দুয়ে-চারে অল্প, ১০. ছড়, শলাকা, ১১. তৎসম শব্দে কিরণ, রশ্মি, ১৩. জওহরলাল নেহেরুর পিতা, ১৪. নারায়ণ, বিষ্ণু।

উপর-নীচ ঃ ১. প্রতিশব্দে শাঁখ, কম্বু, ২. পাইন জাতীয় গাছের এক ধরনের শুকনো ও জমাটো আঠা, শেষ দুয়ে মজুর, ৩. এক মুঘল সম্রাট, শেষ দুয়ে আশীর্বাদ, ৫. উচ্চস্থান থেকে নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে অবতরণের সহায়ক ছাতার মতো যন্ত্রবিশেষ, ৭. পৃথিবী, মরজগৎ, দুয়ে-চারে সাদা এক পাখিবিশেষ, ৯. পদ্ম সমার্থে অতীতের এক 'মিত্র' অভিনেতা, ১০. চূড়া, শীর্ষদেশ, পর্বতশৃঙ্গ, ১২. বরুণদেবের অস্ত্র।

সমাধান শব্দরূপ ৪৮৬

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুণ্ডু
কলকাতা-৬
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম।
দেবলীনা গাঙ্গুলী
হাওড়া-৪

র	হ	স্যা	লা	প	■	■	ত্রি
■	স্ত	■	■	ন	■	■	নে
■	রে	■	■	স	হ	যা	ত্রী
বা	খা	রি	■	■	ব	■	■
■	■	সা	■	■	ন	মু	চি
বা	ক্য	লা	প	■	■	ক্ত	■
ল্মী	■	■	ঠ	■	■	কে	■
কি	■	■	ন	র	পি	শা	চ

সমাধান শব্দরূপ ৪৮৭

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুণ্ডু
কলকাতা-৬
লক্ষ্মণ বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম

ক	■	■	রু	দ্র	মূ	র্তি	■
বি	■	■	ধি	ষি	■	■	■
তা	র	ঘ	র	■	ক	ল	মি
■	ং	■	■	■	■	বে	■
■	চ	■	■	■	■	জা	■
চা	টা	ই	■	সা	ত	ন	লা
■	■	য়া	■	ন	■	■	ল
■	বা	দ	বা	কি	■	■	স

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলন

সংবাদদাতা ।। গত ৮ ও ৯ নভেম্বর হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশু মন্দিরে সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের অষ্টাদশ প্রাদেশিক শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন জেলা থেকে ২৮০ জন শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে তৈরি হল এক সাংস্কৃতিক মিলন মেলা। সর্বভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক আমীরচাঁদজী, বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী স্বপ্না চক্রবর্তী ও প্রাদেশিক সহ সভাপতি পূর্ণচন্দ্র পুইতণ্ডী প্রমুখ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন নৃত্যসাধিকা অলকা কানুনগো। শ্রীমতী কানুনগো তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, সংস্কার ভারতী যেমন ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করে চলেছে তা প্রশংসনীয়। প্রদেশ সভাপতি ভিক্টর ব্যানার্জী তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই এক আছি। আর আমাদের এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেই আমাদের কাজ করতে হবে।

এবারের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্র ভারতীজী। তিনি সকলকে বাংলার সাংস্কৃতিক পরম্পরা ঐতিহ্যের কথা বলেন। প্রকাশ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেমন পরিবেশিত হল লোকসঙ্গীত, কীর্তন, কিছু পুরানো দিনের গানের কোলাজ, তেমনি উঠে এল ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের কথা, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী, আবার সুন্দরবনের মানুষের বিপদকে সঙ্গে নিয়ে বেঁচে থাকার কথা। পরিবেশিত হল আঞ্চলিক কবিতার অপূর্ব কাব্যনাট্য এবং নৃত্যের দুটি সুন্দর অনুষ্ঠান। একটিতে ছিল যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গে রবীন্দ্র নৃত্য ও পাশ্চাত্যনৃত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সম্মেলনে উপস্থিত হন বিশিষ্ট চিত্র প্রযোজক অতনু রায়, বিশিষ্ট অভিনেতা তপন গাঙ্গুলি ও অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সংস্কার ভারতীর প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় কর্মকর্তাবৃন্দ।

দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত সকল প্রতিনিধিকে সুদৃশ্য প্রশস্তিপত্র প্রদান করা হয়। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়।

সিঙ্গুর-লালগড়-নন্দীগ্রাম একই প্রতিবাদের নানান নাম

বিশাখা বিশ্বাস

> কোথাও সিঙ্গুর, কখনো নন্দীগ্রাম আবার কোনও সময় তার নাম লালগড়। সেসব জায়গায় আজ ক্ষমতার বিকৃত সাধনায় উন্মত্ত শাসকের উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে 'নো পাশার্ন'।

ভেড়ার পোশাকে আচ্ছাদিত নেকড়ে ভেড়া ধরতে গেলে ভেড়ারা তাকে চেনেনি, কিন্তু চিনেছিল প্রহরী কুকুর, এবং কুকুরই সেদিন নেকড়ের শরীর থেকে আচ্ছাদন কেড়ে নিয়ে ভেড়াদের সামনে উন্মোচন করেছিল নেকড়ের স্বরূপ। সহাস্যবদনে শুভ্র বসনে যারা মানব-নিধনে হাত পাকায়, মানুষেরা তাকে সচরাচর চেনে না, চিনে ফেলে ইতিহাস এবং ইতিহাসই তখন সেই ঘাতকের মুখ থেকে মুখোশ ছিনিয়ে নিয়ে মানুষকে তার মুখ চেনায়। স্বরূপ চেনাবার ইতিহাসে প্রথম খবরটা ছিল নন্দীগ্রামের। নিরস্ত্র মিছিল হতে হাত তোলা মানুষগুলিকে গুলি করে, জখম মানুষগুলিকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক বাঙালী লেডি ম্যাকবেথের তত্ত্বানুসারে 'দমদম দাওয়াই' এবং শিল্পায়নের ভোজবাজিতে বিত্তশালী বনে যাওয়া এক ভিখিরির সন্তানের আবিষ্কৃত 'আড়ংধোলাই' (বাজারি মার) দিয়ে শেষে জিওলমাছের ঝোল খাইয়ে মানুষগুলোকে দিয়ে বলানো হয়েছিল, আমরা সিপিএম করি, তাই তৃণমূল গুন্ডারা আমাদের গুলি করে জখম করেছিল। সে খবর শুনে কর্তাভজা ২৪ ঘন্টার পর্দায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সমরেশ বাবু বিদ্রূপে বিক্ষোভে বলেছিলেন, আমরাও একদিন মাছের ঝোল খেয়ে এসে বলবো, আমরা সিপিএম করি তাই তৃণমূলী গুন্ডারা আমাদের রাজপথে মিছিলে নামিয়েছিল।

পরের খবরটি লালগড়ের। জিন্দলদের কারখানার নামে ভুলভুলাইয়া পার্টির নির্বাচনী জনসভায় বিস্ফোরণের খবরটি মুখ্যমন্ত্রী প্রথম শোনেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাশোয়ানের মুখে। সরকারকে নিরাপত্তার বেষ্টনী প্রদান করে সরকারের পোষা যেসব উচ্চপদের বেয়নেটধারীরা তারা অনেক পরে মুখ্যমন্ত্রীকে জানালো, বিস্ফোরণ ঘটেছে হাই টেনশন লাইন থেকে। তারপরে সেই বেয়নেটধারীরা রাস্তার ক'টি নাবালক ছাত্র আর রাতের আঁধার ঠেলে কুঁড়ে থেকে বের করে আনলো ক'টি যুবতী মেয়ের শরীর। ভেবেছিল, প্রথমে তাদের 'পা ভেঙে দিয়ে' পরে জিওল মাছের ঝোল খাইয়ে তাদের দিয়েও বলিয়ে নেবেঃ আমরা মাওবাদী দলের সদস্যারা এখন তৃণমূল করি।

কিন্তু, এবারে তা হয়নি। গোবর নিকানো মাটির দাওয়া, দাওয়ায় মাটির প্রাচীর জুড়ে লাউ-কুমড়ো-পুঁইয়ের মাচা, লজ্জাবতীর জংলী সজ্জায় লজ্জাবতী তরুণীগুলো — চেনখোলা কুত্তাদের দাঁতে নখে রক্তাক্ত, কামড়ে কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হলেও হাসপাতালের 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস' -প্রাপ্ত ডাক্তারদের রিপোর্টে অত্যাচারের কোনও ক্ষতের উল্লেখ না পেলেও — অত্যাচারিতা সম্ভ্রম হারানো সেই যুবতীরা সেদিন মাছের ঝোল খায়নি। সীতামণি, পানমণি, গঙ্গামাজি আর ডোমনি মেঝেনরা জখম শরীর ও ইজ্জৎ হারানো দেহ নিয়েও বলেনি, শশধর মাহাতো অথবা রঞ্জিৎ পাল নামক মাওপন্থীদের তারা চেনে। কোনও গোঁফ-না-গজানো ছাত্র কিম্বা অবসর প্রাপ্ত কোনও শিক্ষক হৃদরোগের ওষুধের সাথে বেধড়ক কম্বল ধোলাইয়ের পরেও মাছের ঝোলের গন্ধ হাত থেকে শুঁকে নিয়ে বলেনি, চুল কেটে ফেলে শাড়ি খুলে রেখে পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরা কালীঘাটের কোনও বাঙালী মেয়েকে বিস্ফোরণের আগে/পরে সংশ্লিষ্ট জায়গাটিতে তারা ঘোরাফেরা করতে দেখেছিল।....

তাই, রাজনীতি-নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ লালগড়ের স্বনিষ্ঠ সেই বলিষ্ঠ দ্বিতীয়বারের 'সূর্যোদয়ের' সাধকগণের দুরন্ত বুকেও ধরে গেছে হৃদযন্ত্র বিকলের ভয় — এখন তাই "আলোচনার মাধ্যমে ধৈর্য ধরে' জঙ্গলমহলের দীর্ঘস্থায়ী বঞ্চনা ও শোষণের ক্ষতে, বেয়নেট বিদ্ধ আদিবাসী শরীরগুলিতে প্রলেপ আর পুলটিশ লাগাবার উদ্যোগ। মানবসেবা কারে কয়, এখন চোখ মেলে কেবল দেখলেই হয়।

নন্দীগ্রাম

সিঙ্গুর

লালগড়

কিন্তু, দেখতে হবে আরও কিছু, অনেক কিছুই আছে পিছু। গ্রে-হাউন্ড আর নেড়ীকুত্তার মিশ্র রক্তে যে সব দো-আঁশলারা সিডারের শক্তি নিয়ে মানবশরীরের রক্ত তরঙ্গকে থামিয়ে দিয়ে ত্রিশটি বছর ধরে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে গেছে, তারা এখন নিজেরাই নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করতে শুরু করেছে। মানবসেবার স্বপ্ন চোখে যে তরুণ অতিরিক্ত সুপারটি একদিন কটিদেশে রিভলবার গুঁজে নিয়েছিলেন, কর্তাভর্জা কর্মে প্রতিবাদ করে তিনি পদত্যাগ করা মাত্রই সি. আই. ডি আর রেগুলার পুলিশে বেধে গেছে সংঘাত — নীচুতলার ছাপোষা কিছু পুলিশের কাঁধে শালবনী বিস্ফোরণের প্রেক্ষিতে শাস্তি প্রদানে খোদ পুলিশ মহলেই জ্বলতে চলেছে ধূমায়িত অসন্তোষের অগ্নিশিখা। সেই অগ্নিশিখার তাপে ও ভাঁপে সিদ্ধ হবার ভয়ে-ত্রাসে প্রশাসন ভবনের সুরক্ষিত গৃহতল ছেড়ে আলোচনার জন্যে গ্রামে যেতে সাহসী হচ্ছে না রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পাঞ্জাধারীদের ওপরওয়ালা কর্তাভজা ক্ষমতার নেকড়েরা। আছে ভয়, খোদ নীচুতলার পদাতিক মহলে যদি বিদ্রোহ হয়।

অতএব, নিষ্পাপ নিরীহ ছাগাদির মেষাদির চর্মাবৃত হয়ে এক প্রশান্ত প্রকৃতির দাঁত ভাঙা ছিন্ন নখর ব্যাঘ্রটি হরিণদের গাল চাটতে চাইছে — সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের নায়কটি নিরীহ কণ্ঠে ঘোষণা করছে, জঙ্গল-মহলগুলির জন্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থোন্নয়ন নিমিত্ত নতুন প্যাকেজ তৈরী হচ্ছে। উদ্দেশ্য অবশ্যই মহৎ, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্যটির পশ্চাতের মহত্তর কারণটি হচ্ছে, সামনেই ভোট। তাই অনাহারে অর্ধাহারে শেকড়-বাকড়, কন্দ আর ইঁদুর পুড়িয়ে খেয়ে ত্রিশটি বছর ধরে স্বজাতি-স্বগোত্রের তরুণীদের গ্যাঁদাফুল রঙা নতুন শাড়ি পরিয়ে বাবুদের জনসম্মোহিনী সভায় সভায় নৃত্য পরিবেশন করাতে করাতে যারা মৃত্যুতে স্থাপত্য হয়ে গেছিল, তারাই পেতে পারে রান্নাকরা খাবারের সুস্বাদু প্যাকেট। কেননা, অন্নপূর্ণা-অন্ত্যোদয়-নেহরু রোজগার যোজনা ইন্দিরা আবাস ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের কোটি কোটি টাকার মেরে দেওয়া অংশের সুদের ভগ্নাংশেই কেনা যাবে সেই খাদ্যসম্ভার। ওঝা-মাঝিন আর জড়িবুটি দিয়ে এতকাল যারা কাল কাটিয়েছে এখন স্বাস্থ্যখাতে মেরে নেওয়া কোটি কোটি টাকার দশমিক ভগ্নাংশেই তাদের দোরগোড়ায় উঠে আসতে পারে খোদ সমগ্র হাসপাতালটাই। নববই থেকে চলতি শতাব্দীর ছয় সাল তক কেন্দ্রের জোগানো সতেরো কোটি টাকার সুদেই এখন তাদের দেওয়া হবে শিক্ষার ছত্রতল — জনজাতি জঙ্গলবাসী সমাজের শিক্ষার লক্ষ্য পূরণের মাত্রা (সাক্ষরতা অভিযানের অলীক সাফল্যের মতো) ছাড়িয়ে যাবে আদিবাসীদের শিক্ষাগত মানের সর্বকালের লক্ষণরেখা। 'লতুন লতুন খপর' চাও? — রাইটার্সের নির্দেশে গণশক্তির খবর বানানো কারখানায় চলে যাও।

আসলে, চোরেদের চোখ দিয়ে সমাজের আর্থ অবস্থা ফেরাতে এবং পুঁজিপতিদের কাম দিয়ে উন্নয়নের বার্তা শুনেছিলেন যে বাক-বিপ্লববিলাসী রাজা আর তার মাপাকথার খলনায়ক শিল্পশ্মশানের শকুনিটি, ঝড়ের বাতাসে দুজনেই তারা চোখে দেখছেন সর্ষে ফুল, সর্ষে ক্ষেতের ঠিকানা চৌর্য ও শোষণের সিদ্ধ পীঠ পশ্চিমবাংলা। নিজের চোখে চিরকালের খলতা-শঠতা ও ছলনার মাপ নিতে গিয়ে যুদ্ধ করেছিল আলোর মেয়ে তাপসী, প্রকৃতির সরলাকন্যা গঙ্গামাঝি এবং তার সহযোদ্ধারা — কৃষকের পাঁজরে গড়া বজ্র হৃদয় তাপসী আর আদিগন্তব্যাপী অরণ্যের আরণ্যক মেয়ে পানমণি-ধানমণি-গঙ্গামণিদের অন্য নাম তাই কোথাও সিঙ্গুর, কখনো নন্দীগ্রাম আবার কোনও সময় তার নাম লালগড়। সেসব জায়গায় আজ ক্ষমতার বিকৃত সাধনায় উন্মত্ত শাসকের উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে 'নো পাশার্ন'। রক্ত অশ্রু আর ধর্ষণের ইতিহাসকে পদদলিত করে সে সব জায়গায় আজ আওয়াজ উঠছেঃ অপেক্ষা করো, দুর্জনের হুমকি আর অট্টহাসিতে সূর্য আর উঠবে না, যে সূর্য উঠবে তার সাথে আসবে দিন বদলের প্রভাত। রাজার কোষাগার চুরি করে নিয়ে সাধের ন্যানো পালিয়েছে, মরূদ্যানের ইজ্জতের ওপর বলাৎকার করে প্রাণের বান্ধব সুহৃদ-দেবুরা জেলায় জেলায় প্রতিদিন কারার আড়ালে চলে যাচ্ছে, লালগড় কেটে নিচ্ছে প্রশাসনের টিকির সাথে খোদ রাজাসাহেবের 'টাই'। লজ্জা নাই, হায়া নাই।...

রাজ্যধরপুরে চক্ষু পরীক্ষা শিবির

গত ৩০ নভেম্বর হুগলী ভারতমাতা সেবা সঙ্ঘের রাজ্যধরপুর ইউনিটের উদ্যোগে এবং রোটারী নারায়ণ নেত্রালয়ের সহযোগিতায় আয়োজিত শিবিরে ১৮৭ জন দুঃস্থ ব্যক্তির চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। এঁদের মধ্যে ৩১ জনের চোখের ছানি বিনা খরচে অপারেশন করা হয়। এছাড়া জনসন এন্ড জনসন কোং'র ব্যবস্থাপনায় ১৪১ ব্যক্তির রক্তে শর্করার পরিমাণ নির্ণয়ও করা হয়। শ্রীমদ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী আশীর্বচন দেন। শিবিরে অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রীমতী রত্না দে নাগ, পঞ্চায়েত প্রধান অসীম শীল, বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা শ্রীমতী স্বাতী খন্দকার, লিগাল এইড ফোরামের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ মুখার্জী। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ শ্রীমন্ত চন্দ সহ বিভিন্ন জেলা পদাধিকারী শিবিরে উপস্থিত থেকে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করেন।

শোক সংবাদ

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক ডাঃ জয়দেব রায়ের মাতৃদেবী গৌরীরানী রায় গত ২৪ নভেম্বর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তাঁর আট পুত্র ও ছয় কন্যা সহ নাতি- নাতনিরা বর্তমান। প্রসঙ্গত তিনি স্থানীয় কার্যকর্তা ও সঙ্ঘের প্রচারকদের কাছে প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন।

Swastika
15 December - 2008, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

কলকাতায় জগদীশচন্দ্রের সার্ধশতবার্ষিকী

প্রাণ প্রতিম পাল, কলকাতা ।। 'রেডিও-র জনক' বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর ১৫০ তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গত ১ ডিসেম্বর কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অডিটোরিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তা বিজ্ঞান ভারতী-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা এবং বোস ইন্‌স্টিটিউট। অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি ছিলেন গাগলিয়েলমো মার্কনির নাতি অধ্যাপক ফ্রানচেস্কো পারশে মার্কনি।

ওই দিন দুপুর ২টা ৫ মিনিটে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন জি মার্কনির নাতি অধ্যাপক ফ্রানচেস্কো মার্কনি। এরপর তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বোসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। ফ্রানচেস্কো মঞ্চে আহ্বানের সময় তাঁকে সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতি রেওয়াজ মেনে হাত জোড় করে 'নমস্তে' বলতে শোনা গিয়েছিল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পি সি মাথ্যু বলেন, জে সি বোসের মতো এত বড় মাপের বিজ্ঞানী আমাদের এই কলেজে পড়াশুনা করেছেন। এই মহান বিজ্ঞানীর জন্য আমরা গর্বিত। বিজ্ঞান ভারতীর ডাইরেক্টর তথা সুপার কমপিউটারের আবিষ্কারক বিজয় পি ভাটকর তাঁর ভাষণে বলেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে এক প্রেরণা স্বরূপ।

জগদীশ চন্দ্র বসু

জগদীশচন্দ্র বসুর জীবন এবং কর্ম নিয়ে একটি গ্রন্থ ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশিত হবে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানী বোসের কর্মজীবন নিয়ে তাঁর নানা রকম ছবি সম্বলিত বুকলেট তৈরি হবে এবং ভারতের ১১টি প্রধান ভাষায় ১ লাখ বই এবং সেইসঙ্গে সমসংখ্যক সি ডি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রী ভাটকর আরও বলেন যে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিশেষ অবদানের জন্য একটি সুসজ্জিত ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর আয়োজন করবে। এই ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে এক বছর ধরে ঘুরবে। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে জগদীশ চন্দ্র বোসের জীবন এবং কর্মশালার ছবি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে দেখানো হবে। গত ২৮ নভেম্বর এন আই টি কুরুক্ষেত্রে যে 'জাতীয় যুব বৈজ্ঞানিক সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেখানে তরুণ বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু হিন্দিতে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছে বলে শ্রী ভাটকর জানান।

বিজ্ঞানী জে সি বোসের কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি অধ্যাপক ফ্রানচেস্কো পারশে মার্কনি বলেন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের গবেষণা রয়েছে। তবে রেডিওর ক্ষেত্রে জে সি বোসকে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দেওয়াটা ঠিক নয়। মিলিমিটার মাপের বেতার তরঙ্গ সৃষ্টির বিষয়কে মার্কনি খুবই কৌশলগতভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন।

স্মরণিকা উন্মোচন করছেন ফ্রানচেস্কো মার্কনি এবং ভি পি ভাটকর।

বর্তমান যুব সমাজকে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগী হতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ৯২ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এসে মার্কনি একা জগদীশচন্দ্র বসুকে 'ফাদার অফ্ রেডিও' ঘোষণার কথা মানতে রাজি নন। তবে জগদীশচন্দ্র বসুর অন্যান্য আবিষ্কারকে তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন।

ওই দিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক সঞ্জীব ঘোষ, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডাইরেক্টর অধ্যাপক শিবাজী রাহা প্রমুখ। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের বিভিন্ন সময়ের বেশ কিছু দুর্লভ ছবি, তাঁর আবিষ্কার সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে পরিবেশন করেন বিজ্ঞান ভারতীর সহ সম্পাদক রঞ্জন ঘোষ।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ অডিটোরিয়ামে জগদীশ বসুর জীবন ও কর্মজীবন নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপচে পড়েছিল ভিড়। হাজির ছিলেন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিদ্বজ্জন, ছাত্র-ছাত্রী, বিজ্ঞানী-গবেষকরা। তাই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের কথায় — " ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায় এই বিজ্ঞান মন্দির দেব চরণে নিবেদন করিলাম"। 'বন্দে মাতরম্' গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের সার্ধশতবার্ষিকীতে শোভাযাত্রা

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ১৫০ তম জন্মদিনে গত ৩০ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা দক্ষিণ বিভাগের, দক্ষিণ পশ্চিমভাগের কালিঘাট নগরের স্বয়ংসেবকরা হরিশপার্ক প্রভাতশাখা থেকে গণবেশে একটি সাইকেল শোভাযাত্রা করেন। আশুতোষ মুখার্জী রোড, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড হয়ে রাজাবাজারের বসুবিজ্ঞান মন্দিরে শোভাযাত্রাটি পৌঁছায়। বসু বিজ্ঞানমন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অভেদানন্দ রোড ধরে কেশব ভবনে পৌঁছায়। সেখানে এক অনুষ্ঠানে সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী, কেশবরাও দীক্ষিত, বংশীলাল সোনী, নারায়ণ পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মার্কনি সাহেব ভাঙলেন তবু মচকালেন না

অর্ণব নাগ ।। 'ফ্রানচেস্কো পারশে মার্কনি' নামটার সঙ্গে আপামর বাঙালীর তেমন পরিচয় নেই। সুতরাং নামটা বললেই মনে প্রশ্ন জাগে — ইনি কে? কি করেন? অবশ্য তাঁর নামটা জানতেই হবে এমন নয়। নিঃসন্দেহে ইনি একজন গুণীজন। ইতালীর বলোনা ন্যাশান্যাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের একজন জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানী। এরকম তো কত রয়েছেন! তাতে কী? কিন্তু এই বিজ্ঞানীর নামটা অপরিচিত হলেও পদবীটা বাঙালীর চিরকালীন অসহায়তার ক্ষোভের পরিচায়ক হয়েই থাকবে। কারণ বাঙালী বিশ্বাস করে ভগিনী নিবেদিতার বিশ্বস্ত বন্ধু বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর ফর্মুলা হস্তগত করে এবং সেইসঙ্গে আবিষ্কারের পেটেন্ট জাতীয় কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটির সুযোগ নিয়ে রেডিও আবিষ্কারের চিরকালীন কৃতিত্বটা নিজের কাঁধে তুলে ফেলেছেন গাগলিয়েলমো মার্কনি। ঠিকই ধরেছেন এই ফ্রানচেস্কো সাহেব ওই মার্কনিরই নাতি। দাদুর কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে যাঁকে ছুটে আসতে হয়েছে সুদূর ইতালী থেকে। এমনকী, দাদুর মতো রেডিও ফিজিক্সের লোকই নন তিনি। তাই বোধ হয় এক প্রকার ধরেই নিয়েছিলেন বিজ্ঞান সংক্রান্ত কোনও জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে না তাঁকে। বরং যাঁর ১৫০তম জন্মদিন উপলক্ষে এদেশে আসা সেই জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর দাদুর 'বৈজ্ঞানিক' সম্পর্ক নিয়ে যে নাড়াঘাটা হবে তা যেন জানতেনই। তাই কূটনীতিটা ভাল করেই রপ্ত করে এসেছিলেন তিনি। এবং বলা যায় এতে একশো শতাংশ সফলও হয়েছেন। গত ৩০ ডিসেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বক্তৃতা থেকে শুরু করে তার পরদিন সেন্ট জেভিয়ার্স অডিটোরিয়াম হলে ও পরে সাংবাদিক সম্মেলন যেন একই কূটনৈতিক অনুরণনে বেঁধে রেখেছিলেন নিজেকে। যেখানে ফ্রানচেস্কোর মুখে বারবার তাঁর দাদুর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ঘটনাটা 'আনফরচুনেট' শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে কোনও আনফরচুনেট ঘটনাই তো শেষ পর্যন্ত ফরচুনেট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে ফ্রানচেস্কো সাহেবের এত হা হুতাশের কি আছে? কিন্তু ওই যে বললাম, এক নিদারুণ কূটনীতি। একটি পাও তিনি ফেলেননি তার বাইরে। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে কি নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন মার্কনি? এ জাতীয় প্রশ্নে একবারের জন্যেও উত্তেজিত হননি। খুব ঠান্ডা মাথায় বলেছেন, 'প্রকৃত সত্যে সকলেই নিরুৎসাহ'। সেই প্রকৃত সত্যটা অনেকটা এরকম — জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত মার্কারি কোহেরার যন্ত্রের মাধ্যমে মার্কনি তারবিহীন শব্দ প্রেরণের উপায় উদ্ভব করেন। এবং তিনিই প্রথম তাঁর ট্রান্সমিশনে 'হর্ন অ্যান্টেনা' ব্যবহার করেছিলেন যা তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে গ্রহণ করেছিল। আসলে জগদীশচন্দ্র ও মার্কনি একই পদ্ধতিতে (দুটি ধাতব দেহের মধ্যে উচ্চ বিভবযুক্ত স্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ) তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের জন্ম দেন। কিন্তু এ বিষয়ে পেটেন্টের দাবি করায় আবিষ্কারের কৃতিত্বটা মার্কনিকেই দেওয়া হয়। জগদীশচন্দ্র একদা বলেছিলেন, তিনি এ জাতীয় পেটেন্টে বিশ্বাসী নন। ফ্রানচেস্কোকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে দৃশ্যতই অস্বস্তিতে পড়ে যান তিনি। জানিয়ে দেন, নিজেও একজন বিজ্ঞানী, তাই এজাতীয় পেটেন্টে তিনিও বিশ্বাসী নন। অস্বস্তি ঢাকতে বারবার বলছিলেন, বোজে (জগদীশ চন্দ্র বসু) ও মার্কনির যৌথ প্রচেষ্টার ফল রেডিও'। ব্যাখ্যা করেছিলেন টিউনিং বিষয়টি।

মার্কনি

এসব হল বটে, কিন্তু ফ্রানচেস্কোর কাছে বাঙালির প্রাপ্তির ভাঁড়ারটি শূন্যই থেকে গেল। একবারের জন্যও জগদীশচন্দ্র বসুকে রেডিওর আবিষ্কারক বললেন না তিনি, এড়িয়ে গেলেন বঞ্চিত বিজ্ঞানীর নোবেল প্রাপ্তির বিষয়টিও। তাই শীতের সন্ধ্যায় বাঙালী কোনও বিজ্ঞানীকে দেখেনি, দেখেছে অসাধারণ এক কূটনীতিককে।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com